প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম ও একুশ শতকের বাংলা উপন্যাস

বিশ শতক যদি হয় বাংলা উপন্যাসের বিকাশ ও সমৃদ্ধির কাল, তাহলে একুশ শতক বাংলা উপন্যাসের বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় শক্তভূমিতে দাঁড়ানো বহু শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ এক সুবিপুল, সুবিস্তৃত মহীরুহের কাল। একুশ শতকে পৌঁছে ঔপনিবেশিক কাঠামোগুলিকে একদম ছুঁড়ে ফেলে, আখ্যান নির্মাণে আমরা যে স্বকীয়তার স্বাধীনতা অর্জন করেছি---তা হলফ করে বলা যায়। পঞ্চাশের দশকের কিশোর কথাকারদের কলম এই শতকে এসে আরো বলিষ্ঠ রূপে প্রকাশিত হলেও---উপন্যাস গ্রন্থনে মোটামুটি বিশ শতকের বাস্তবতা প্রণয়নের ধারাবাহিকতাই বজায় রেখেছিলেন তাঁরা। মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, বা পরে সমরেশ মজুমদার প্রমুখের সম্পর্কে একথা বলা চলে। পরিচিত ছকের বাইরে এসে প্রাগুক্ত লেখকদের লেখনী কখনো-সখনো যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী অভিনব আখ্যান চয়ন করেননি তা নয়।

তবে বিশ শতকের অন্নদাশংকর রায়, গোপাল হালদার বা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর মনন সমৃদ্ধ উপন্যাসের ধারা কিংবা মেদবহুল আখ্যানের নির্মাণ, একুশ শতকে প্রায় বিলুপ্তির পথে এগুবে। বিলুপ্তির পথে এগুবে ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় পুষ্ট ঔপন্যাসিক বয়ানগুলোও। আখ্যানের যে অভিনব দিশা দেখিয়েছিলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য, প্রাক-আধুনিক পর্বের বিস্মৃত দেশজ পরম্পরাকে পুনরুদ্ধারের যে নিরলস প্রয়াস দেখিয়েছিলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার বা দেবেশ রায়---এই শতকে এসে তারই ব্যাটন তুলে নেন সিংহভাগ কথা লিখিয়েরা। অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত---এঁরা কেউই উপন্যাসকে রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের মাধ্যম হিসেবে পণ্যে পরিণত করতে রাজি নন। এঁরা প্রত্যেকেই দেশজ ধরনকে

পুনরাবিষ্কার, পুনর্নির্মাণ এর মধ্য দিয়ে---নিজস্ব পদ্ধতিতে একটি বিকল্প বাস্তবের আদল তৈরি করলেন। বিশ শতকের শেষ চারটি দশক বাঙালি সমাজে এত বেশি পরিবর্তনশীলতা সক্রিয় ছিল যে, দীর্ঘদিন অটুট থাকা বাস্তবের আদল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। একুশ শতকে সেই ধারা আরো প্রকট হল। উপনিবেশের কালো হাত আমাদের মাথার উপর উঁচিয়ে থাকেনি ঠিকই; কিন্তু দেশীয় রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে ঔপনিবেশিক আদর্শ অনুকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। লক্ষ্য করা গেল গ্রামীণ সমাজকে ব্রাত্য রেখে পুঁজিবাদের প্রতি শাসকের আস্থা। তাকেই মদত দিতে নির্মিত হল কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিরোধী প্রতিষ্ঠান। অমিতাভ সমাজপতি, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বিনতা রায়চৌধুরী, অভিজিৎ তরফদার, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, শেখর মুখোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার, অহনা বিশ্বাস, বিনোদ ঘোষাল, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়---প্রমুখ অধিকাংশের লেখায় পূর্বজ দেশজ ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা প্রায় বিদায় নিল। এল শুধু সামাজিক সমস্যা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অবক্ষয়ের চিত্ররূপ, সভ্যতার সংকট, কিংবা জীবনের ভাঙা-গড়ার গল্প। তাতে নেই কোন প্রতিবাদের উত্তুঙ্গ তর্জনী বা শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সুস্থ জীবনের সংস্থান বা বাস্তবতাবোধের কোন অভিনব চয়নিকা।

সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতার এ হেন অনিশ্চয়তায়, অস্থিরতায় বেশকিছু সংবেদনশীল নবীন কথাকারেরা অনুভব করলেন, যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতি দায়বদ্ধতা দিয়ে প্রজ্বলিত সমস্যার সমাধানকল্প আর সম্ভব নয়। অতীত-ঐতিহ্যের, মিথস্ক্রিয়ার, স্বপ্ন ও স্মৃতির গভীর বাস্তবতা দিয়েই নির্মাণ করতে হবে আধুনিক কথার সংরূপ। পুনর্মূল্যায়নের প্রতিজ্ঞা নিয়েই এই সময় কিছু লেখক বিশ শতকের দেশভাগ তথা উদ্বাস্তুর বিদগ্ধ স্মৃতিকে আর একবার উস্কে দিলেন যেমন---যেমন উস্কে দিলেন তেভাগা বা অপারেশন বর্গার স্মৃতিকে; তেমনি একুশ শতকেও, জ্বলন্ত সময়ের কৃষিজমিতে শিল্পায়ন বা বিশ্বায়নের আগ্রাসন বা সাংস্কৃতিক পণ্যায়ন বা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের অপ্রতিরোধ্য গতিতে স্তব্ধ করে দিতে আখ্যানে এল বিকল্প বাস্তবতার গ্রন্থন। ঠিক যে অর্থে প্রায় দেড়'শ বছর আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় দেশজ পরম্পরার উপর নির্ভর করে নির্মাণ করেছিলেন ঔপনিবেশিক প্রতিরোধী বয়ান। বিশ শতকের পুরানো বৃত্ত, কাহিনি পরম্পরা, সময়ের ধারাবাহিকতার প্রচলিত কথা

বিন্যাসের যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, রামকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে; তাকেই এবার আরো তীক্ষ্ণতার সঙ্গে রূপ দিতে দেখা যাবে নবারুণ ভট্টাচার্য্য, নলিনী বেরা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায, শৈলেন সরকার, দেবর্ষি সারগী, শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, সোহরাব হোসেন, রবিশংকর বল, সাধন চট্টোপাধ্যায়, সুকান্তি দত্ত, শুভঙ্কর গুহ প্রমুখ কথালিখিয়ের ঔপন্যাসিক আখ্যানে। বিপুল পরিসরের কারণে আমরা কিছু নির্বাচিত উপন্যাসিকের নির্বাচিত উপন্যাস আলোচনা করে দেখাতে চাই যে, একুশ শতকে বাংলা উপন্যাসের ভুবনে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের সংবদল কিভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

নবারুণ ভট্টাচার্য : প্রত্যাঘাতের প্রতিসন্দর্ভ

‘পাঠকের কাছে প্রশ্ন’ কবিতায় নবারুণ ভট্টাচার্য বলেছিলেন :

‘কত জায়গায় তো ফেলি আমি দেশলাই
একবারও ভুল করে নয়
যদি কেউ আগুন জ্বালায়।
ভয় করে, এর পরে হয়তো একদিন
মানুষ আগুন জ্বালাতে ভুলে যাবে।...
মানুষ যদি বিদ্রোহ করতে ভুলে যায়
তখন তাকে মনে করিয়ে দেওয়া
কি পাপ ?’[১]

বস্তুত একুশ শতকে সামাজিক ও রাজনৈতিক নকলের আসরে নবারুণ ভট্টাচার্যের কাছে সাহিত্য হল অস্ত্র। সরকারের দাপুটে সব শাসক, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আচ্ছন্ন সব বড় বড় ব্যবসায়ী সমিতি, ও শোষণের ভিতে গড়ে ওঠা তাদের অভিজাত জীবন---এই মোহনীয় তরঙ্গকেই তিনি ফালাফালা করেন সাহিত্যের অস্ত্র দিয়ে। যিনি এ কথা বলতে পারেন :

‘আমি কারোর দালালি করি না। আমি একজন ব্যক্তিগত মানুষ এবং লেখক হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে সোসাইটির কাছে। আমি

সেটা ফুলফিল করি। এবং সে ক্ষেত্রে আমি কাউকে স্পেয়ার করি না। এবং সে ক্ষেত্রে আমি কাউকে ভয়ও করিনা'[২]

তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। আর একজন নির্ভীক মানুষই পারেন পুঞ্জিভূত মিথ্যা আর বিকারের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলে কথা বলতে। 'কাঙাল মালসাট' (২০০৩) হল তাঁর সেই প্রতিবাদী তর্জনী।

'কাঙাল' অর্থ হাভাতে। কোনরকমে কষ্ট করে দিন গুজরান করে যারা। আর 'মালসাট' অর্থ বীরের স্পর্ধা পূর্বক হুঙ্কার। উপন্যাসের কাঙাল হল নবারুণের বিস্ময়কর সামাজিক আবিষ্কার ফ্যাতাড়ু আর চোক্তার। তাহলে 'কাঙাল মালসাট' মানে দাঁড়ায় গরিবদের প্রতিনিধি হিসেবে চোক্তার আর ফ্যাতারুর যৌথবাহিনীর বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ রাষ্ট্র তথা সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পুলিশ-প্রশাসন, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও উচ্চবিত্তের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে। এইসব শক্তিধর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়ার মতো লোকবল বা অর্থবল কোনটাই নেই এই ফতুর সমাজের। অথচ সমাজের অসুখ সারাতে হবে। তখনই আশ্রয় নিতে হয় ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের আধারে।

আখ্যানটি আমরা দেখব তৃতীয় একটি চোখ দিয়ে, সে বড়িলাল। ফ্যাতাড়ু বাহিনীর তিনজন মদন, ডি.এস, পুরন্দর ভাট; আর চোক্তার বাহিনীর ভদি, বেচামণি, নলেন। আর পুরো পরিকল্পনাটির দায়িত্বে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন দাঁড়কাক। অষ্টাদশ শতকে বেগম জনসন (১৭২৮-১৮১২) -এর আমলের এই দাঁড়কাক। শুরু হচ্ছে দাঁড়কাকের দাপট :

'কা ... আ ...'

---কি চাইছ বাবা ?

---চোপরাও। ফের কতা বললে মুখে আঁসবঁটি ভরে দেব। খোল, শালা চাকতির ঘর।

ভদি আর কালবিলম্ব না করে বেচামণির কাছ থেকে চাবির গোছা নেয়। চাকতির ঘরের তালাটি কোম্পানির গোড়ার দিকের দাসলক। দরজার ওপারে বোঁ বোঁ শব্দ যেন হাজার খানেক ভীমরুল পাকসাট মারছে। ঘর খুলতেই ছোট সাইজের কয়েকটি চাকরি বা উড়ন্ত চাকি

সাইরেনের মতো শব্দ করে তেড়ে বেরিয়ে ঘোলাটে আকাশে উধাও হয়ে গেল। বড় চাকতিগুলো বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে কিন্তু বেরোচ্ছে না। দরোয়াজা খোলাই থাক। ওরা ইচ্ছেমতো বেরোবে, ঢুকবে। তোরা তোদের কাজ করে চল্‌। ঠিক টাইমে আমি ফের এসে পড়ব। দণ্ডকাক হুস্‌ করিয়া উড়িয়া গেল।'[৩]

বস্তুত স্নেহহীন দয়ামায়াহীন ভালবাসাহীন এই বসুন্ধরার রাক্ষস গুলোকে শায়েস্তা করার জন্য যে রীতিমত পরিকল্পনা চলছে দাঁড়কাকের। মনুষ্য কণ্ঠের ভাষণে সে পরিকল্পনাটি খুব সুন্দরভাবে বোঝা গেল।

আমাদের এই সামাজিক অসুখটি ঠিক কবে শুরু হয়েছিল সেই ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে লেখক বড়িলালের গভীর স্বপ্নে আমাদের জানাবেন, উনিশ শতকের গোড়ার দিককার সাহেবদের কথা। তখন সাহেবদের বিলাসিতা আর কামুকতার পাপ রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। বড়িলাল আরো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলে দেখব, ১৮০৩ সালে পত্তন হওয়া রেসকোর্সে সাহেবদের নোংরামো উলঙ্গ করে দিয়েছিল সমাজকে। রংমাখা মানুষগুলো ঐতিহ্যকে লোপাট করে কলকাতাকে ভেঙ্গে, দুমড়ে-মুচড়ে, গলিয়ে, খুবলে চেঞ্জ করে দিচ্ছে---এইটা কিছুতেই যেন লেখক মানতে পারছেন না। তারপর শুরু হল ইতিহাসের বিকৃত নির্মাণ। বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে লেখালেন ইতিহাসের বিকৃত পাঠ। প্রাজ্ঞ দাঁড়কাকের দৃষ্টি দিয়ে লেখক আমাদের দেবেন ইতিহাসের সত্য পাঠ। কলকাতার ভিক্টোরিয়া, যেখানে আমরা দেখব একদল ব্রিটিশকে একটি কিউরেটর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এই বলে যে 'সবই চার্নকের দয়া', 'সবই চার্নকের দান'। বারবার এই কথা শুনে দাঁড়কাক আর স্থির থাকতে পারেনি। চোখ পাকিয়ে বলে :

'একটা ঠোক্কর খেলেই বুঝবি কার দয়ায় করে খাচ্চিস। হারামির হাঁড়ি কোথাকার। যা, অভিশাপ দিলুম তুই পরের জন্মে গুয়ের পোকা হয়ে জন্মাবি। গু খাবি, গু মাখবি তারপর একদিন গুয়ে ডুবেই পটলে যাবি।

কিউরেটর ভাবিয়াছিল সজোরে একটা পেপার ওয়েট ছুঁড়িবে কিন্তু সাহসে কুলায় নাই।

---চার্নক ওয়াজ আ গ্রেট ম্যান। উনি না হলে কলকাতা হত ? কলকাতার তিনশো বছরে ঘোড়ার টানা ট্রাম চলত ? অত পত্র-পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু বেরোত ? অত সেমিনার হত ?...

---চার্নক ওয়াজ এ গ্রেট বাল। ওই বোকাচোদা এল আর গঙ্গার পাড়ে হেগে কলকাতার পত্তন করল---তোর মতো হারামি না হলে ওই লুটেরা মাগিবাজটাকে আদিপিতা বলে চালানো যেত ? ছাগলের দেশে রামছাগল যা বলে সেটাই অকাট্য যুক্তি। রামপাঠা !

---সে আপনি যা বলেন বলুন, তাতে চার্নকের গ্রেটনেসে এতোটুকুও আঁচড় লাগে না। যা ট্রুথ আমি তাই তুলে ধরেছি।

---চোপ ! ট্রুথ তুলে ধরতে হয় না। ট্রুথ ঝুলঝাড়ু নয়। ট্রুথ শেখাচ্ছে। জোসেফ টাউনসেন্ডের নাম জানিস ? টাউনসেন্ড ছিল রেন্ডিবাজ এক গ্যাঞ্জেস পাইলট। চার্নকের সাকরেদ। মাগিবাজিতে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। চার্নক ! ফাক চার্নক !'[৪]

মানুষ-দাঁড়কাকের কথোপকথনের এই বয়ানটি ম্যাজিক রিয়ালিজমের সুন্দর উদাহরণ। আমরা বাঙালিরা চোখ বন্ধ করে ব্রিটিশের দেখানো, ব্রিটিশের চশমা পরা ঐতিহাসিকদের দেখানো দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাস পাঠ করছি। চার্নকের চরিত্রের উদ্‌ঘাটনে লেখক একজন শিক্ষিত বাঙালি চরিত্র আনতে পারতেন। কিন্তু সেই বাঙালি কোথায় ? সব ধান্দাবাজ, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, নেমকহারামের দল। এদের থেকে লেখকের দৃষ্টিতে অনেক বেশি প্রাজ্ঞ এই দাঁড়কাক।

অতঃপর আমরা দেখব, লেখক বামপন্থী রাজনীতির অন্দরে ঢুকেছেন। শাসন তখন কুড়ি বছর অতিক্রান্ত। পার্টি রাজ চলছে সর্বত্র। আদর্শ বামপন্থীরা হয়ে পড়ছে কোণঠাসা, ব্রাত্য। কমরেড আচার্য তেমনি একজন চরিত্র। তাকে চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক পার্টি। বামপন্থীর এই একদেশদর্শী মেরুকরণে কমরেড আচার্যরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। দুষ্ট লোকেদের কি করা যায়, তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। একটু অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের উপর রাখা ভ্লাদিমির স্তালিনের কালো পাথরের মূর্তির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিলেন। হঠাৎ মূর্তিটি কথা বলে উঠল :

'---ভেবেছিস ফটো বানিয়ে রেখে দিয়ে পার পেয়ে যাবি ?

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে কমরেড আচার্যের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে পাইপের ধোঁয়ায়।

---কমরেড স্তালিন !

---থাক্‌। ওসব ন্যাকামি আমি অনেক দেখেছি। ভেবেছ মালটা কিছু বোঝে না। আমি বুঝি না। ঠিক টাইমে হাতে পড়লে তোর এই দোনামোনা ন্যাকড়াপনা ঘুচিয়ে দিতাম।

---সে তো জানি কমরেড।

---ঘেঁচু জানো। আর ফের যদি আমাকে কমরেড বলবি তো এক থাবড়া মারব। বিপ্লব করেছিস ? কাকে বলে জানিস ?

কমরেড আচার্য মাথা চুলকোন।

---করিস তো শালা ভোট। আর কিছু করতে পারবি বলেও তো মনে হয় না। যেগুলো আলতুফালতু গাঁইগুঁই করছে সেগুলোকে এত তোয়াজ করছিস কেন ?

---ঠিক তোয়াজ নয় স্যার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আত্মপক্ষ ...

---থামলি কেন, বলে যা---

---মানে স্যার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ওদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেখানে দু'মাস বরাদ্দ সেখানে তিন মাস ...

---কেন ? সময় কি মাগনা না ফাউ ? আর তুই, ওদের কথা বাদ দে, তোর মনটা কোন দিকে ? সেটা ঠিক করেছিস ?

---আজ্ঞে, আপনিই বলে দিন। কিছু তো ভেবে উঠতে পারছি না। ...

---১৯৩৫-এর ২৪ আগস্ট কি হয়েছিল জানিস ?

পাইপের ধোয়া ঘুরপাক খায়। স্লাভ ভাষায় কিছু চিৎকার। গুলির শব্দ।...

---যাই হোক, আমি আবার আসব। পাইপের ধোঁয়া কমরেড জে. ভি. স্তালিনের ফটোর কাঁচের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে শুরু করে।'[৫]

ঐ গুলির শব্দে আমরা দেখব, রাশিয়ায় এমন কিছু দল বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়েছিল। কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বস্তুত

রাশিয়ার বামপন্থী আদর্শ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কতটা ভগ্নপ্রায় ও ছদ্মবেশী রূপ নিয়ে যাচ্ছিল তাকেই লেখক এই অদ্ভুত জাদুবাস্তবতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করলেন।

এই ঘুন ধরা পার্টির অরাজক নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে বাংলা আজ ভবিষ্যৎহীন। তাই দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে আঘাত হানতে আখ্যানে আস্তে আস্তে ঢুকবে অলৌকিক বাস্তবতা। দাঁড়কাকের নির্দেশে কলকাতার আকাশে উড়বে কাটা মুণ্ডুর চাকতি। শহরবাসী তাজ্জব হয়ে দেখবে। স্বাধীনতার পর যেসব সরকারবিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তার সব কটিই ছিল নিরস্ত্র। কিন্তু এবার স্বতন্ত্র বিপ্লব করে ক্ষতগুলো মেরামত করতে চান লেখক। দাঁড়কাকের নির্দেশে তার প্রথম পদক্ষেপ বন্দুক উৎপাদনের কারখানা খোলা। পারমিশন নিতে ভদি এ কে ফরটি সেভেন নিয়ে চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকে। সরকারের ঘরে শোরগোল ফেলে দেয় এই অ্যাটাক। প্রচন্ড ভীত হয়ে চেয়ারম্যান ঢুকে যায় বাথরুমে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কথা বলে উঠল এ. কে. ফরটি সেভেন :

> '---নতুন প্লাস্টিক ম্যাগাজিনে ৩০ রাউন্ডই ভরা যায়। প্রত্যেকটা বুলেটের ওজন ৫৩.৫ গ্রেইন, সেকেন্ডে ৯০০ মিটার যায়, ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরি ধরলে ৪০০ কেন, প্রায় ৫০০ মিটার ...
>
> ---ও রে বাবা, এসব জেনে আমি করবটা কি ?
>
> ---হিসি।
>
> ---ঠিক আছে। করছি।
>
> ---হ্যাঁ, ঠিক করে করো আর যা বলছি শুনে যাও। কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেলের সব মডেলই হল গ্যাস অপারেটেড। ...
>
> ---তাতে আমার কী ?
>
> ---এক রাউন্ড ফায়ার করার সময় যে গ্যাস তৈরি হয় সেটা ব্যারেলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে উপরের গ্যাস সিলিন্ডারে চলে যায় ...
>
> ---আমি শুনতে চাই না।
>
> ---কেউই চায় না কিন্তু শুনতে হয়। সিলিন্ডারে ওই গ্যাসটা প্রসারিত হয়ে পিস্টনটা পেছন দিকে ঠেলে দেয়।
>
> ---আমি শুনব না।

---এবার একটা ঝাপটা মারব। শুনব না। মামাবাড়ির আবদার। চোপ্! পিস্টনটা লাগানো থাকে...

---বাঁচাও ! বাঁচাও !

টয়লেটের দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন চেয়ারম্যান। গেলাস-এর ঢাকনাটা হাত দুয়েক ওপরে উঠে বনবন করে ঘুরছে। ঘরে কেউ নেই। কম্পিউটারের পর্দায় একটি এ কে ফরটিসেভেনের নকশা নানা দিক থেকে দেখা যেতে থাকে। টিভি সেটটি সহসা চালু হয় এবং তাতে দেখা যায় মুখে কালো কাপড় বাঁধা একটি লোক চেয়ারম্যানের দিকে এ কে ফরটিসেভেন তাক করছে, সেল ফোন বাজে, কানে ধরতেই ক্রমাগত ফায়ারিং-এর শব্দ ...

গুলিবিদ্ধ না হয়েই চেয়ারম্যান কেলিয়ে পড়লেন।'[৬]

এই হল ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম। শাসকের সঙ্গে একেবারে তাক করে কথা বলছে বুলেট। বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম শাসকের বিরুদ্ধে মানুষের ভাষায় কথা বলল বুলেট। নিঃশব্দে আর নয় এবার বিপ্লব হবে সশস্ত্র। একেবারে মুখোমুখি লড়াই।

এই ঘটনার পর ফ্যাতাড়ু ও চোক্তাররা একটু ভয়ে ভয়ে থাকে। এমন সময় তার দাঁড়কাক হাজির হয় তাদের সামনে। একটু দেশি বাংলা মদ খেয়ে নেয়। তারপর ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে :

'...কোন ঢপবাজকে আমরা রেয়াত করব না। কম করে ৫০ হাজার ছোট বড় কারখানা বন্ধ নয় হাঁপের টানে ধুঁকছে। সেদিকে কারও খেয়াল নেই। বাঁড়া, ডাউনস্ট্রিম মারাচ্ছে। ফর্মুলা ওয়ান রেসিং। হোটেল ! কার পারকিং প্লাজা ! সামলাও এবার চাকতি ?'

ফের রব ওঠে।

---'চাকটি কা খেল জিন্দাবাদ।

ডাউনস্ট্রিম মুর্দাবাদ'

---'চেয়ারম্যানেরা নিপাত যাক্।

নিপাত যাক্। নিপাত যাক্।'[৭]

আন্দোলন এভাবে ধীরে ধীরে ঘন হতে থাকে।

বাঙালির ঐতিহ্যকে ধ্বংস করবার জন্য কেবল রাজনীতিবিদরাই যে দায়ী তা নয়; এবার দেখব লেখক আমাদের সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত মানুষগুলো কিভাবে আমাদের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে তার কিছু নমুনা পেশ করেছেন। তিনি বলছেন আজ বাঙালি কথায় কথায় সেমিনারে বাকতিন ঝাড়ে, ফুকো ঝাড়ে; কলকাতায় পাঞ্জাবি, গুজরাটিদের দাপট সম্বন্ধে গ্রামসির হেজিমনি তত্ত্ব আওড়ায়। অথচ আমাদের এত সংখ্যক পরমহংস আছেন যে, আর কোনও জাতিতে নেই। অথচ তাদের সম্বন্ধে এঁরা কিছুই জানেন না। 'অধঃপতনে কোন জাতি এতটা পটু নয়।' লেখক এই বাঙালিকে শিক্ষা দেবার জন্যই হাত ধরেছেন ফ্যাতাড়ু ও চোক্তারের। এই অরাজক অবস্থাটি বদলাবার জন্যই যেন নবারুণের কলম ধরা। আলোচ্য আখ্যানে বাঙালি পিতা-মাতা, নকশাল, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি কাউকে রেয়াত করেননি লেখক। ভন্ড লোভী বাঙালিকে শায়েস্তা করার জন্য উড়ন্ত ফ্যাতাড়ুর আবির্ভাব (চৌদ্দ নম্বর অধ্যায়) জাদুবাস্তবতার চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। কলকাতার বিখ্যাত জুয়েলারি ভি ডি দত্তের একটি পার্টি। তাক লাগানো সেই অনুষ্ঠানে মঞ্চ আলো করে বসে আছেন ফুটবল, ইতিহাস, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, ফ্যাশন ডিজাইনার, পেডিকিউর, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপালগণ। গোটা চারেক চ্যানেলের ক্যামেরা চলছে। হঠাৎ দুরন্ত ধুতি পাঞ্জাবি গায়ে বাংলা মদ খেয়ে মঞ্চে প্রবেশ লেখক এর প্রিয় ফ্যাতাড়ু ডি.এস। সঞ্চালকের কাছ থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করল :

> '---একেনে সব হেক্কড় টাইপের মাল বসে আচে। অন্তত আপনাদের তাই ধারণা। কিন্তু সবই আলফাল। গিদ্‌ধড়। ওই যে ইতিহাস মারাতে যে মালটা এসেছে ও হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর কিউরেটর। ওর মুখটা দেখুন। ভাবছে আমি ফাঁস করে দেব যে বাঞ্চতের পোঁদে গু। কি রে দেব ? কাল দুপুরে কি করেছিলি ?
> কিউরেটরকে নিজের এলিয়ে যেতে দেখে পাশের বিশিষ্টরা ঘাবড়ে গেল। পুলিশ এগোয়। পার্ক স্ট্রীটের ওসি চেঁচায়,
> ---আপনি কে ? আপনি কি ইনভাইটেড ?
> ---আমার নাম ডি.এস। কোক শাস্ত্রর ওপরে অথরিটি। ইনভিটেশনের গাঁড় মারি। আর কিছু ?

হলে তুমুল হট্টগোল। কেবল্ চ্যানেলরা ডি.এস-এর ছবি তুলছে। এই সময় হলে আলো নিভে গেল। পুলিশ ও হলের সিট দেখানোর আশারদের টর্চ। সেই আলোয় দেখা যায় ডি.এস তিন-চার মানুষ হাইটে উড়ে বেড়াচ্চে। হাতে কর্ডলেস। সব ছাপিয়ে ডি. এস-এর স্টিরিও ভয়েস---

---এবারে বাঁড়া বুঝেচতো আমি কে ? ম্যায় হুঁ ডি. এস। এই চোদনা ওসি টর্চ মেরে কী করবি---আমাকে ধরবি-

এই সময় ঝপ করে চার-পাঁচ সেকেন্ডের জন্য আলো ফিরে এল। দেখা গেল কোক-শাস্ত্রের ওপরে অথরিটিই শুধু নয়, ওপরে আরও দুটি মানুষ অর্থাৎ মদন ও পুরন্দর ভাটও উড়ছে। এবং বিশাল দাঁড়কাক।'[৮]

হাই-প্রোফাইলের মানুষ বলে যারা পরিচিত আমরা সাধারণ জ্ঞানের মানুষেরা তাদের দেখে সিঁটিয়ে থাকি। কিন্তু তাদের ভাল মানুষীর আড়ালে যে কেচ্ছা আছে, তাকে হাই-প্রোফাইলের লেখকরা কিছুতেই তুলে আনতে পারতেন না। ফ্যাতাড়ুর চমকপ্রদ উড়ন্ত ক্ষমতা দিয়ে লেখক যেভাবে একে একে পণ্ডিতদের প্রকাশ্যে হাঁড়ি ফাটিয়েছেন---আখ্যানের আঙিনায় অভিনব বৈকি ! আলৌকিক বাস্তবতার সাহায্য না নিলে লেখক এই হাই-প্রোফাইলদের হাত থেকে কিছুতেই তিন জনকে বাঁচাতে পারতেন না। ফলে অধরাই থেকে যেত এই প্রতিবাদ।

পুঁজিবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এই মশকরা তোলপাড় ফেলে দিল বাংলার রাজনীতিতে। ফ্যাতাড়ু চোক্তাররা অনির্দেশ্য থেকে ঘোষণা করল যুদ্ধের। বার্তা ছড়িয়ে দিল। শুরু হল মহাযুদ্ধ। এবার সরকারের সঙ্গে এবারের সমর একেবারে সশস্ত্র সংগ্রাম। আমরা দেখব আকাশে উড়ে উড়ে তারা কিভাবে বোমা দিয়ে, বন্দুকের নল দিয়ে শাসককে ধুরমুস করে দিচ্ছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই প্রাজ্ঞ দাঁড়কাক। আমরা জানব যে, এই দাঁড়কাক আর কেউ নয়-ভদির বাপের ভূত। ভদির এই রাষ্ট্রদ্রোহী সাধনা ভদির বাপের মাথায় প্রথম প্রোথিত হয়েছিল। কিন্তু সে যাত্রায় সে একা থাকায় এঁটে উঠতে পারেনি। তাই ফ্যাতাড়ুর সঙ্গে এক হয়ে, ভূতের বাপের ভূত দাঁড়কাক হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য সলতে পাকিয়েছে ও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই দাঁড়কাকের দৃষ্টি দিয়েই লেখক অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলার

উপর ঘটে চলা ধর্ষণের চিত্রগুলোকে একে একে সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন। লেখক এর বক্তব্য : 'দশ ও দেশের মুখোজ্জ্বল করার অভিসন্ধি নিয়েই 'কাঙাল মালসাট' শুরু হয়েছিল ... আমার এই বিনামূল্যে বিস্তারিত রচনাটির লক্ষ্য সরকার ও প্রশাসনকে আগাম হুঁশিয়ারি দেওয়া।' (পৃ-৮৪) ঠিক লাতিন আমেরিকায় যে উদ্দেশ্য নিয়ে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম -এর অভিনব আধারটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল; তারই সার্থক উত্তরসূরি হয়ে উঠেছে একুশের 'কাঙাল মালসাট'।

নবারুণের কুকুরদের নিয়ে লেখা 'লুব্ধক' (২০০৬) কে দেখা যাবে সাধারণ মানুষকে কুকুরের মধ্যে দিয়ে দেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

দ্বি তী য় প রি চ্ছে দ

কিন্নর রায় : স্বপ্ন ও স্মৃতিতে প্রতিরোধী বাস্তবতার সন্ধান

এক

অন্তহীন সময়ের স্রোত থেকে সমস্যাদীর্ণ মানুষের জীবনকে দুইহাতের অঞ্জলিতে ভরে নিয়ে আধুনিক বাস্তবতার নিকেল দিয়ে পরিশুদ্ধ করে জীবনের মুকুর ফুটিয়ে তুলতেই কলম ধরা যাঁর, তিনি কিন্নর রায়। অনাকাঙ্ক্ষিত দেশভাগের সঙ্ঘবদ্ধ পরিবারগুলোর দুঃখে তিনি যেমন চোখের জল আটকে রাখতে পারেন না; তেমনি কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের জিহাদী ধ্বংসকে তিনি তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে আছড়ে মারতেও ভুল করেন না। সবকিছু পেরিয়ে স্বপ্ন, স্মৃতি ও ঐতিহ্য দিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত নির্মাণ করেন ভবিষ্যতের শীর্ষবিন্দু।

কলকাতার ব্রহ্মপুর বাজারকে কেন্দ্র করে শিবু নস্কর ও পিরু আলির চেতনার ভিতর দিয়ে একটি স্থির ও একটি অস্থির সময়ের চিত্র উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে 'স্বপ্নপুরাণ'-এ (২০০০) রচিত হয় জাদুবাস্তবতার সংবদল। উপন্যাসের মুখবন্ধে লেখক

বলেছেন : 'এই উপন্যাসটি স্বপ্নের বাস্তব ও বস্তবের স্বপ্নে বারবার যাতায়াত করেছে।' প্রথমে দেখা যাক শিবু নস্করের স্বপ্নের বাস্তবকে।

সবজি ব্যবসায়ী শিবু নস্করের জীবন অত্যন্ত সাধারণ। সাধারণ মানুষজনের সাথে তার মেলামেশা। দাদার শালী বীথিকে বিবাহ করে দুই সন্তানের পিতা। হঠাৎ করে তাদের জীবনে তৃতীয় নারীর প্রবেশ জীবনটাকে উলটপালট করে দেয়। ফুটবল টুর্নামেন্টে পাওয়া একটি দেওয়াল ঘড়িকে কেন্দ্র করে আখ্যানে প্রবেশ ঘটে জাদুবাস্তবতার। কাজের ব্যস্ততায় দেওয়াল ঘড়ির দিকে সময় দেখতেই সে চমকে উঠল :

> 'লাফিয়ে লাফিয়ে চলা ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে শিবু তাঁর প্রথম বউ বীথির মুখ দেখতে পেল। ভারী, গোল মুখ। আমার দুই ছেলে চয়ন আর সন্তুর মা। চয়ন সাত। সন্তু পাঁচ। বীথি আমার দাদার শালি।
>
> ঘড়ির কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে। শিবুরাম নস্কর তার বড়দা দীনবন্ধু নস্করকে দেখতে পেল।
>
> বড়দা এখন সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। আমরা ছ ভাই। দু বোন। ...
>
> ঘড়ির হলদেটে ডায়ালে বীথির মুখ মুছে গিয়ে সন্তুর মুখ, চয়নের মুখ।
>
> বাবা, বাবা---ও, বাবা, আমাদের নিয়ে চল।
>
> বাবা, আমাদের এখানে থাকতে ভালো লাগে না।
>
> এসব শুনতে শুনতে চোখে জল এলো শিবুর। আর তখনই ঘড়ির ডায়ালে চয়ন, সন্তুর মুখ সরে গিয়ে পাপড়ি ফুটে উঠল।'[৯]

এই হল ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম। এখানে কোন রাজনৈতিক সংকট নেই। প্রতিবাদের কোন জোরালো আবেদনও নেই। আছে শুধু ব্যস্ততম ব্যক্তিজীবনে কাছের মানুষগুলোর অমলিন চলাচল আর ভালোবাসা। ব্যস্ততম একজন মানুষের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একটি ঘড়ির ডায়ালে সবার মুখের আনন্দ লাভের এই যে বয়ানটি, একেই তো মার্কেজ বলেছিলেন ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম।

পাপড়ি আর বীথিকে নিয়ে শিবুর যে সংকট, এটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের একটি আবহমান সমস্যা। লঙ্কা লেবুর ব্যবসায়ী শিবু যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন তার দু'চোখে নেমে

আসে অঘোর ঘুম। হলুদ ডায়ালওলা কোয়ার্জ ঘড়িটা এবার উঠে আসে তার স্বপ্নে। ঘড়ির ভেতর পরিষ্কার নিজেকে দেখতে পায় শিবু। আস্তে আস্তে তার মুখ মুছে গেলে ডায়েলে ভেসে উঠে একটি ন্যাড়া মাথার মানুষের ছবি। ছবিটি হঠাৎ করে কথা বলতে শুরু করল। এতদিন ঘড়ির ডায়ালে সে কেবল চেনা মানুষের মুখগুলো দেখতে পেত। এবার একটি অচেনা লোক, সে আবার কথা বলছে :

> ‘বুদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দানোৎসব পবিত্র কঠিন চীবর দান।
>
> কি দান বললে ?
>
> ন্যাড়া মাথা বলে উঠে, কঠিন চীবর দান।
>
> সে আবার কি ?
>
> যা বলছি শোনো শিবুরাম। তুমি তো শিবুরাম নও। তুমি আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে ছিলে শুদ্ধশীল।
>
> কি শীল ?
>
> শুদ্ধশীল।
>
> কি যা তা বলছ !
>
> ঠিকই বলছি শিবুরাম। তুমি ঘড়ির গায়ে নিজের পাঁচশো বছর আগের চেহারা দেখ। তিন জন্ম আগে। এই জন্মের তিন জন্ম আগে তুমি যা ছিলে সেই ছবিই ফুটে উঠবে ঘড়ির ভেতর।
>
> তুমি কে ? তুমি আসলে কে ?
>
> আমি মহাসময়। তোমার সঙ্গে আছি শিবু। তুমি ঘড়ির দিকে তাকাও।
>
> ঘড়ির হলুদ ডায়ালের দিকে তাকিয়ে শিবু এক জন রোগাসোগা ন্যাড়ামাথা মানুষের মুখ ফুটে উঠতে দেখল। তার মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই। গাল বেশ বসা।
>
> ঘড়ির ভেতর থেকে কথা উঠে আসছে। ...
>
> যেসব বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষুগণ আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস কঠোর সাধনার মাধ্যমে একই বিহারে বর্ষবাস করে থাকে, শুধুমাত্র সে সব বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষুদের চীবর দান করা

হয়।... ধর্মীয় শাস্ত্র মতে কঠিন চীবরলাভী ভিক্ষুগণ পাঁচটি পাপ থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন এবং পাঁচটি পুণ্য ফল ভোগ করেন। ...

অ্যাত সব শুনে আমি কি করব ? ঐ সব চীবর ফীবরের আমি কি জানি ! আর জানবই বা কেন !

মাথা ঠান্ডা করে শোন শিবু। ঘড়ির ভেতর থেকে ন্যাড়া মাথা ছবি যেন বলে উঠল। ... তুমি মনে কর শিবু। মনে করার চেষ্টা কর।

আমার কিছুই মনে পড়চে না। মনে পড়বে। মনে পড়বে।

এসব কথায় লম্বা হাই আটকে গেল শিবুরাম নস্করের। শিবু দেখতে পেল তার সামনে বটতলার ঋষি রাজনারায়ণ বসু রোড মুছে গিয়ে একটা মাটির রাস্তা ফুটে উঠেছে। আবছা আবছা সেই রাস্তার অনেকটা হেঁটে গেলে বহু ন্যাড়া মাথা মানুষ। তাদের গায়ে জড়ানো কাপড়। সবই এক রঙের। গম্ভীর কি এক সুর ভেসে আসছে দূর থেকে। বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি.....সংঘং শরণং গচ্ছামি.....ধম্মং শরণং গচ্ছামি---ঘড়ির ভেতর থেকে এই শব্দ উঠে আসছে।...

শিবুরাম নস্কর মাটির লম্বা রাস্তা পেরিয়ে অনেকখানি যাওয়ার পর উঁচু মঞ্চের সামনে সারি সারি ন্যাড়ামাথা মানুষদের দেখতে পেল। সকলের পোশাকই প্রায় একরকম। সেই ভিড়ের মধ্যে শিবু যেন নিজেকেও দেখতে পেল। শিবুরাম নয়, শুদ্ধশীল।'[১০]

একুশ শতকের মানুষেরা যূথবদ্ধ সমাজের কাঠামো ভেঙে দিচ্ছে। বেরিয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ জীবন যাত্রায়। ফ্যাশন দুরস্ত দুনিয়া তার চটকদারি হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নিজেকে নিয়ে ভাবতে ও নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মানুষ। সময়ের এই ক্ষয়ের প্রতিরোধ প্রকল্পেই লেখক কাহিনিকে হঠাৎ করে পাঠিয়ে দিলেন দেড়শো বছর পূর্বে; যেখানে রয়েছে সৎচিন্তা ও সৎকর্মের প্রতি নিষ্ঠা। নীতির প্রতি শ্রদ্ধা। আত্মশক্তির প্রতি আস্থা। প্রবাহমান ব্যস্ততম বর্তমানের সঙ্গে মানবতার এই সাধনাকে অন্তর্ভুক্ত করে লেখক এক সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার এই সাধনা অতীতের বাস্তবে একদিন ছিল। কিন্তু বর্তমানের বাস্তবতায় এমনভাবে লেখক তুলে আনলেন যে পড়তে পড়তে আমদের মনে হবে,

যেন জাদুর দেশে আমরা প্রবেশ করছি। তখনই বয়ানটি হয়ে উঠল ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম।

উপন্যাসের এক অদ্ভুত চরিত্র পিরু আলি; যে জীবনের গল্প বলতে ও শুনতে ভালোবাসে। বাঙালিদের মধ্যে যে হিন্দু-মুসলিমের বিভাজন, মুসলমানের পাকিস্তানি বা আরবিয়ানের প্রতি উদগ্র ভালোবাসা কারণে ভারত তথা বাংলার প্রতি ঘৃণা---পিরু আলির সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের এক অলৌকিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তিনি সেই ধারনায় এবার আঘাত হানলেন। হিন্দুস্থানে মুসলমানরা সুখে নেই---মুসলমানদের এই ধারণাকে আঘাত করতেই তিনি কলকাতার ব্রহ্মপুরে নিয়ে এলেন লাদেনকে। দেখাতে চাইলেন মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে লাদেনের মতো শয়তানরা আছে বলেই কোন মানুষ শান্তিতে নেই; যে শান্তি বাংলায় আছে, ভারতে আছে। লাদেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল। পিরু আলি একদিন বাজারে যেতে শেখপাড়ার পুকুরপাড়ে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখে লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটি বসে আছে। আর বলছে 'জেহাদ ! জেহাদ ! জেহাদ ! 'আখ্যান আস্তে আস্তে প্রবেশ করছে এক অলৌকিক বাস্তবতার জগতে :

> 'জেহাদ। জেহাদ। পুকুর ঘাটের হাওয়ায় কথাটা ঢুকে যাচ্ছে।
> শেখপাড়ার পুকুর ঘাটে বিড় বিড় করে বলছিল লাদেন। তারপর একসময় জোরে চেঁচিয়ে উঠল---জেহাদ। জেহাদ। হিন্দুস্তান হল দারু উল হারব।
> দার উল হারব মানে কি ? কিছুতেই বুঝতে পারছিল না পীরু।
> দার উল হারব মানে মূর্তি পূজকদের দেশ---যারা মূর্তি পুজো করে।
> কে যেন ফিস ফিস করে বলে গেল।
> কে বলল ! ঠিকমতো ঠাওর করতে পারল না পিরু।
> চাঁদের আলো পড়েছে লাদেনের বুক অব্দি কাল দাড়িতে। কালোর ভেতর সাদা দাগ। বয়স হলে যেমন হয়। গায়ে সাদা আলখাল্লা। মাথায় সাদা রঙের পাগড়ি। গোল করে প্যাঁচান।
> কিন্তু নবিজির দেশের লোক হয়ে সব সময় এমন 'জেহাদ জেহাদ' করে কেন ? ইসলাম মানে তো শান্তি। পিরু মনে মনে মসজিদের ওস্তাদজির কাছে শোনা কথা আওড়াচ্ছিল।

শেখপাড়ার পুকুর ঘাটে আরবের ওসামা বিন লাদেন বসে থাকে। তার হাতে এ কে ফিফটি সিক্স।

আমরা এদেশে ভালো আছি লাদেন। বাবরি মসজিদ ভেঙে দিলেও এদেশে সবাই বাবরি ভাঙাওলাদের মতো হয়ে যায়নি। লাদেন, তুমি কেন জেহাদের ডাক দিচ্ছ ! কেন ডাক দিচ্ছ জেহাদের ? এদেশ আমাদের। আমরা এদেশে থাকব। বলতে বলতে পিরু দু-হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

শেখপাড়ার পুকুরঘাটে এ কে ফিফটি সিক্স হাতে ওসামা বিন লাদেন তখনও বসে।

না, লাদেন তুমি ভালো না। তুমি ঝাও।

লাদেন---ওসামা বিন লাদেন তবুও বসে থাকে শেখপাড়ার পুকুরঘাটে। তার দু চোখ স্থির।[১১]

এরপর ব্রহ্মপুরের ভরা বাজারে পিরু দেখে বুক ছোঁয়া লম্বা দাড়ি নিয়ে লাদেন। বাতাসে ভাসতে থাকে সেই জেহাদের কথা। আর তখনই :

'পিরুর সামনে সকাল আটটা সাড়ে আটটার ব্রহ্মপুর বটতলার বাজার বদলে গিয়ে ঢেউ তোলা মরুভূমির বালি ফুটে উঠল। অনেকটা দূর দিয়ে এক সারি উট চলে যাচ্ছে। তাদের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে বালির ওপর। বালির উঁচু উঁচু ঢিবি পেরিয়ে যাচ্ছে উটেরা। মাথার উপর চড়া সূর্য। খুব রোদ্দুর।

লু মেশান হাওয়ায় গরম বালির কণা ছিটকে এসে বিঁধে যাচ্ছে গায়ে-মুখে। ছ্যাঁকা লাগছে। নিজের গায়ে পরিষ্কার সেই আঁচ টের পেল পিরু।'[১২]

বস্তুত জেহাদীর সঙ্গে গেলে একজন মানুষের জীবন কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে; লু মেশান তপ্ত বালির আঁচ দিয়ে লেখক কৌশলে তা বলে দিলেন। এখানে দুটো বাস্তবতাই সত্য। কিন্তু কলকাতার বাস্তবতায় হঠাৎ করে লাদেন ও মরুভূমির বিস্তার এনে লেখক বুঝিয়ে দিলেন যে, হিন্দুস্থানে পিরু আলির মতো মুসলমানরা আছে। জেহাদীর চক্করে গেলে জীবনটা কারবালা হয়ে যেতে পারে।

হতে যে পারে তার একটি বয়ান এবার তিনি নির্মাণ করলেন। হঠাৎ করে লাদেন জেহাদী ডাকতে ডাকতে জোর করে তুলে নিল পিরু আলিকে; তালিবানি রাজ দেখাবে বলে। ব্রহ্মপুর থেকে হঠাৎ করে আখ্যান উড়ে যাবে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে :

> 'ও বাপ লাদেন, এ আমারে কোতায় নে এলে বাপ ! এসব তো জিন-পরিদের কেস্যায় হয়। এক দম উড়গে নে এলে।
>
> দূরে দূরে গোলা ফাটছে। কানে তালা ধরে যায়। হাওয়ায় বারুদের গন্ধ। সাদা পাগড়ি, সাদা পায়জামা শেরওয়ানি পরা লাদেনকে তখনই আবারও চোখের সামনে দেখতে পেল পিরু।
>
> আমায় কোতায় তুলে নিয়ে এলে বাপ লাদেন ! বাপ-চাচার কালে অ্যাত পাহাড়, গোলাগুলি কখনও দেকিনি।
>
> পিরু হাওয়ায় ফিসফিসানির ভেতর কতগুলো নাম শুনতে পেয়ে মনে মনে বলল, কি সব নাম শুনছি চারপাশে---পীরপঞ্জল, কান্দাহার, কাবুল ...
>
> গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার---খুব লড়াই হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমাদের। ভারী জঙ। ইনসাল্লা। আমরা জিতবই।...
>
> বাইরে আবার ভয়ানক জোরে গোলা ফাটল।
>
> পিরু ভয়ে চোখ বুঝল।
>
> তোমরা আবার মুসলমান নাকি ! সাচ্চা মুসলমান জেহাদের ডাকে কখনো ভয় পায় না। কাফের---মূর্তি-পূজকদের মেরে তারা নিজেদের জন্যে বেহস্তের রাস্তা পাকা করে। নয়তো শহিদ হয়। শহিদ হলেও তার জায়গা বেহস্তে পাকা। আমেরিকাকে আমরা যেভাবে হোক দেখে নেব। একেবারে খতম করে দেব যাকে বলে। হালাল করব। একের পর এক বোমা ফাটাব। পাগল হয়ে উঠবে আমেরিকার শাহেনশা ক্লিনটন।...
>
> আর ইন্ডিয়া---তারও রেহাই নেই আমার হাত থেকে। একটার পর একটা কারগিল, দ্রাস, বাতালিক হবে। আমার ফৌজ---তালিবানরা

বাঙ্কারে ডুকে স্টিঙ্গার মিসাইল ছুঁড়বে। ইন্ডিয়ান ফৌজকে নাস্তানাবুদ করে দেব আমরা।

গর গর করতে করতে এসব কথা বলে যাচ্ছিল লাদেন।

গোটা দুনিয়া চালাবে তালিবানরা। ইনসাল্লা। দাড়িতে বাঁ হাতের আঙুল ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে ডান হাতের মুঠোয় ধরা এ কে ফিফটি সিক্স-এ চুমু খেল ওসামা বিন লাদেন। ইস্পাতের নলে আশ্চর্য ঠান্ডা অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়ে হাত পা হিম হয়ে গেল পিরুর।'[১৩]

বস্তুত পরাধীনতার আমল থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটা দ্বান্দ্বিকতার, বিবাদের, বিভাজনের চেহারা নিয়ে আছে। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে অনেক। কিন্তু মুসলমান জেহাদের নামে যা করে তা যে এই মাটির সঙ্গে কতটা অসঙ্গতিপূর্ণ এমন বার্তা আমরা অন্তত বিশ শতকে পাইনি। আবার সরাসরি কোনো বক্তৃতায় এই বার্তাটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কিছুতেই দেওয়া যায় না। তাহলে মুসলমান বিদ্বেষী তক্‌মা এঁটে যেতে পারে। অথচ লেখক তার ব্রহ্মপুরের হিন্দু-মুসলিমের সহাবস্থানের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই স্পষ্ট কথাটির মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিলেন একটি অলৌকিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। ম্যাজিক রিয়ালিজমের লক্ষ্যই হল সমাজকে একটা সুস্থ জীবনের স্বপ্ন উপহার দেওয়া; যেটা 'স্বপ্নপুরাণ' দারুণভাবে উঠে এসেছে।

দুই

'ধূলিচন্দন' (২০০৫) উপন্যাসে বিশ শতকের বাংলার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। এক, দেশভাগের যন্ত্রণা ও তজ্জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। আর দুই, বঞ্চনা ও তজ্জনিত মাওবাদী সমস্যা। আত্মকথনের ভঙ্গিতে উপন্যাসের এক জায়গায় তিনি বলছেন :

'একখান দ্যাশ ক্যান ভাইঙ্গা দুইখান হয় ! ক্যান হয় ? মেঘপাল, মেঘডম্বরুরা (দুটি হাতি) আটকাইয়া থাকে বর্ডারে। তারা না খাইতে পাইয়া না খাইতে পাইয়া, জল না পাইয়া ধুকতে ধুকতে মারা যায়। ক্যান, তারা মরে ক্যান ? নেহরু, প্যাটেল, জিন্না, শ্যামাপ্রসাদ

দ্যাশটারে ভাঙল, তার বদলে আমরা কি পাইলাম ? আমাগো ধূলিচন্দন চিরদিনের জইন্য হারাইয়া গেল।'[১৪]

বস্তুত 'ধূলিচন্দন' উপন্যাস হল ওপার বাংলার ধূলিচন্দন গ্রামের ইতিহাস; উদ্বাস্তুর ইতিহাস; বুক ভাঙা গল্পের ইতিহাস। এখানে ধূলিচন্দন কেবল একটি গ্রাম নয়; সারা বাংলাদেশের সমস্ত হিন্দু পরিবারের প্রতিনিধি এই গ্রাম। যার বর্ণনা দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সারা বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হিন্দু পরিবারগুলোর দুর্দশার ছবি। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ধূলিচন্দনের ষাটোর্ধ্ব রাজশেখর সান্যাল আজ চাঁদনী রাতের জলঙ্গীর অগভীর জলে চাঁদের আলো ভাঙতে ভাঙতে বর্ডারের দিকে এগোয়, তখন তার দেশভাগপূর্ব রাজশাহীর বাড়ির দিনগুলোর কথা বিদ্যুৎ রেখার মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ষাট বছর আগে মেঘডম্বরু আর মেঘপাল-এই দুটো পোষ মানা হাতিকে ছেড়ে আসার দুঃখে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। এই দুঃখে সাড়া দিয়ে ষাট বছর আগে মৃত দুই হাতি হঠাৎ যেন প্রাণ নিয়ে হাজির হয় তার সামনে। দেশভাগের মারাত্মক প্রভাব কিভাবে একজন জমিদার পয়সাওয়ালা মানুষের জীবনকেও ছিন্নভিন্ন করে পথের ভিখারি করে দিয়েছিল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরেছেন এখানে লেখক। হিন্দুরা যাবে ইন্ডিয়াতে আর মুসলমানেরা পূর্ব পাকিস্তানে---দেশভাগের এই নিয়ম মান্য করে যেসব লাহিড়ী, চৌধুরী, সান্যালরা এপার বাংলায় আসে বুক ভাঙা হৃদয় নিয়ে রাজশেখর তাদেরই একজন। ষাট বছরের স্মৃতি তার একমাত্র সঙ্গী। তাই বর্তমানের বাংলার চিত্র দিয়ে আখ্যানের শুরু হলেও পুরো উপন্যাস জুড়ে স্মৃতির সরণি বেয়ে যাবে শুধু ওপার বাংলার সান্যাল বাড়ির সুখের দিনগুলোরও ছবি।

এই স্মৃতির টানেই আখ্যানে আসে অতীত আর বর্তমানের এলোমেলো যাতায়াত। সময়ের জটিল বিস্তার। রাজশেখরের স্মৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেখা যাবে তার সঙ্গে হঠাৎ কথা বলছে মৃত হাতি দুটো। কথা শেষ হলে কথার পিঠে চাপতে থাকে স্মৃতি। মনে পড়ে ষাট বছর আগের দিনগুলো। মেঘডম্বরু বলে উঠত রাজশেখরকে :

'যাবে নাকি পদ্মার চরে ?

কেন ?

খুব মজা হবে।

কি মজা ?

জ্যোৎস্নায় যদি বালির ওপাশে পড়ে থাকা পদ্মা দেখ, বুঝতে

পারবে কেমন আনন্দ হয়, এসব কাজ করলে'[১৫]

হাতির সাথে মানুষের এই সৌন্দর্য ও রূপচর্চা চমকে দেয় আমাদের। পুরো উপন্যাস জুড়ে মানুষের সঙ্গে নানান প্রাণীর এইরূপ কথোপকথন আপাতভাবে মনে হবে অলৌকিক, অসম্ভব। কিন্তু দেশ হারানো যন্ত্রণার একটা অসীম পাহাড় যখন বুকে চেপে বসে, তার থেকে নিরসনের জন্য এই অতীত চর্চা ব্যতীত উদ্বাস্তু মানুষগুলো বাঁচবে কি করে ?

বস্তুত জলঙ্গি ধরে হাঁটার পথে তারা যে দুটো হাতির সাক্ষাৎ পায় তারা মেঘডম্বরু ও মেঘপাল নয়। তারা জংলা হাতি। অথচ রাজশেখর যখন তাদের মেঘ ডম্বরু ও মেঘপাল নামে ডাকে তখন তারা সেটা মেনে নেয়। বিষয়টা হল দেশভাগের ফলে একটি মানুষের জীবনে এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট দুটো অজানা হাতির মতো পশুরা বুঝে ফেলে। অথচ দেশের রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পারলেন না। দুটো পশুর এই বোধগম্যতার মধ্যে লেখক তীব্র ব্যঙ্গ হেনেছেন রাজনৈতিক নেতাদের বোধগম্যতা নিয়ে। তাই সঙ্গত কারণেই চাকর বৈতালের মুখ দিয়ে লেখক প্রশ্ন করে বসেন,- 'দ্যাশটা ভাইঙ্গা টুকরা টুকরা করণের কি প্রয়োজন আছিল। ব্রিটিশ তো এমনিই পলাইতে সিল।'[১৬] জ্যোৎস্না মাখা রাতে একটি ভরা সংসারের খান খান হয়ে যাওয়া অসম্ভব দুঃখে কাতর হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া বাতাসেরও মনে প্রশ্ন জাগে, মানুষকে বড় ভয় ! তবুও চুপি চুপি তারা প্রশ্ন করে :

> 'তোমরা কি ইন্ডিয়া থেকে এলে ? বাতাস জানতে চায় ফিসফিস করে।
>
> তোমরা কি দলমার ? প্রথমটার পর তোমরা কি চলে এলে দুমকা থেকে হাঁটতে হাঁটতে ? হাওয়ার পরের প্রশ্ন এরকম। উত্তর না পেয়েই পরের প্রশ্ন করে হাওয়া।
>
> তারা দু'জনে হ্যাঁ, না-কিছুই বলে না। শুধু শুঁর তুলে ছোট ছোট চোখ এক দু'বার পিট পিট করতে করতে সারা গায়ে মাখাতে থাকে চাঁদের সাবান।' [১৭]

পার্টিশনের মত অমানবিক সিদ্ধান্তে বাতাসের এই ফিসফিসানি কথা, হাতিদের নিজেদের মধ্যে কথা---এই অতিবাস্তব গুলোকেই আমরা বলব ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম। স্বাধীনতার স্বাদ কি এই বাংলাদেশের উদ্বাস্তু মানুষগুলো জানতেই পারলো না !

উদ্বাস্তুর দুঃখের পাশাপাশি হাতিদের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে লেখক এক অদ্ভুত প্যারাডক্স তৈরি করেছেন। সার্কাসে পশু খেলা বন্ধ করার নির্দেশ যখন দেওয়া হল সরকারি পক্ষ থেকে, তখন প্রতিটি চাঁদনী রাতে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করে কামিনী নামক একটি হাতি। মানুষের মতো তার স্বপ্নের বিবরণে আমাদের মনে হয় কোন পরাধীন মানুষ যেন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের মধ্যে দেখল বন থেকে বর্ষার কালো মেঘের মতো কিছু হাতি তাদের মোহগ্রস্তের মত ডাকছে :

'কোথা থেকে এলে তোমরা ? স্বপ্নের মধ্যেই জানতে চাইলো কামিনী।
কেন, জঙ্গল থেকে।
কোন জঙ্গল ? কোথাকার জঙ্গল ?
কোন উত্তর নেই।
কি, বলবে তো !
ঘুমের মধ্যেই ফিসফিস করে কামিনী' [১৮]

সুবর্ণরেখার তীরে ঘাটশিলার গভীর বন থেকে সব হাতিরা তাদের শুঁড় বিছিয়ে ডাকছে। এর পরেই স্বপ্নে তারা পেয়ে যায় তাদের মালিককে। তারপরে ফের দলমাদের। এভাবে স্বপ্নের পর স্বপ্নে রচিত হতে থাকে হাতিদের স্বাধীনতার সংবদল :

'বনের দুই হাতের মধ্যে একজন ফিস ফিস করে বলে উঠল, এবার
আমরা যাব রাতমোহানা, ফুলডুংরি।
আমরা যাব চিরুগোড়া, কিরিবুরু, জাদুগোড়া, বলল আর এক
বনহস্তী। আর কোথায় কোথায় যাব ? জানতে চাইল কামিনী।
আরো বহু জায়গায়। দলমা পাহাড়ের কাছেও চলে যেতে পারি।
নয়ত দুমকাতেও।
সত্যি ? বলল কামিনী।
তোমরা মিথ্যে বলছ না তো ! জানতে চাইল সুন্দরী।
না, না মিথ্যে বলব কেন ! সত্যি যাব।'[১৯]

বস্তুত সার্কাস দেখানো সুন্দরী ও কামিনীর হঠাৎ এই পরাধীনতা থেকে মুক্তির আনন্দে আমরা চমকে উঠি। স্বাধীনতার জগতে পদার্পণ করবার পর তাদের সুখের দিনগুলোর নকশা তৈরি করতে থাকে তারা। আর হতভাগা এই মানুষেরা স্বাধীনতার

রাতেই তাদের কাছে কালবৈশাখীর দুঃস্বপ্নের মতো ধেয়ে এল সংসার ভাঙার, ঘর ভাঙার দুঃখ।

অতঃপর আখ্যানে উঠে আসে সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। কলকাতার বিখ্যাত সব কলেজ ছাত্রদের গ্রামকেন্দ্রিক গড়ে তোলা নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা; তার থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন ঝাড়খন্ড আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় একেবারে লোকাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মানুষ তার অধিকার আদায় করে নেয়। কিন্তু পশু সভ্যতার কথা কেউ কোনদিন ভাবেনি। নয়া রাষ্ট্রনীতিবাদে উন্নয়নের নামে ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য লেখক সুকৌশলে রিপোর্টারের ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন একটি হাতিকে। কথা বলতে থাকে হাতি :

> 'আমরা কোথায় যাব ? দাঁতাল জানতে চায়। ক্রমশ জঙ্গল কমে আসছে একটু একটু করে। তাও কাটাকাটির পর যেটুকু বন-বাদাড় ছিল, সেখানে আবার তোমরা সেঁদছ। তোমাদের হাতেও বন্দুক। ওদের হাতেও বন্দুক। মাঝখানে আমরা। আমাদের কোন বন্ধুক নেই, বারুদ নেই। গ্রেনেড, আর ডি এক্স, ল্যান্ডমাইন-কিছু নেই। তাহলে আমরা কোথায় যাব বাপু হে ? সর্বত্র নাকি খুব উন্নয়ন হচ্ছে, এসব শুনতে পাই এখন। কিন্তু আমাদের উন্নয়ন নিয়ে তো কেউ ভাবে কি ?'[২০]

কথনের এই ভঙ্গিমা আমাদের চমকে দেয়। কিন্তু অসভ্য রাষ্ট্রনেতারা যখন পশু তো দূরের কথা মানুষের কথাই ভাবেনি, সেখানে তাদের দুঃখ কষ্ট জীবন সংগ্রামের কথা জানানো দরকার ছিল। বিশ শতক পর্যন্ত আমরা কোন লেখাতে পশুদের এইভাবে প্রশ্ন তুলতে দেখি নি ! একটি প্রাণ মানে তারও বাঁচতে যে সংগ্রাম করতে হয়---একথা খুব দুঃখের সঙ্গে লেখক জানিয়েছেন। বিশেষত বাংলার উত্তরবঙ্গে এটি একটি জ্বলন্ত সমস্যা।

রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এ. কে. ফরটিসেভেন উঁচিয়ে, মাইন ফাটিয়ে মাওবাদীরা যে অধিকার আদায় করতে চায়, তাদের সঙ্গে এবার এক নৈতিক আদর্শের আশ্চর্য বয়ান রচনা করেছেন লেখক। অসম রাইফেলের সঙ্গে মণিপুর ছাত্রের লড়াই বা কমিউনিস্টদের প্রতিরোধী সংগ্রাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে দলপতি হাতি এবার কথা

বলতে শুরু করে। নগর সবকিছুকে গ্রাস করে নিচ্ছে। সন্ত্রাস দমনের নামে ফৌজিরা বলাৎকার করছে। রাষ্ট্র নামক এক ভয়ানক শেকলকে ভেঙে দিতে যেন লেখক এই অধ্যায়টি রচনা করেছেন। দলপতি এক তেইশের নকশালকে প্রশ্ন করে :

> 'তোমরা মাইন ফাটাও কেন ? উফ, কী ভীষণ শব্দ ! সহ্য করা যায় না।
>
> রাষ্ট্র, সরকার আমাদের ভাষা বোঝে না। ভাষা বোঝাতে গেলে মাইন ফাটাতে হয়। বাইশ-তেইশ আকাশের দিকে মুখ তুলে এসব কথা বলে।...
>
> চাঁদে ভেজা দলপতি আবার জানতে চাইল, তোমরা মাইন ফাটাও কেন ? কারণে-অকারণে
>
> ওই যে বললাম, আমরা রাষ্ট্রের কানের ভেতর জল ভরে দিতে চাই।
>
> সবাই তোমরা একই ভাষায় কথা বলতে থাকো কেন বল তো ! সকলেই এক সুরে কথা বলো। যেন অরণ্যদেবের ঢাক।...
>
> দলপতির কথা শুনে বাইশ-তেইশ ম্লান হাসল। তার হাসির রেখায় বিঁধে গেল চাঁদ।
>
> তোমরা মাইন ফাটাও কেন ?
>
> বললাম তো।
>
> এটা কোনো উত্তর নয়। জানো মাইনে, মাইন ব্লাস্টে কী সর্বনাশ হচ্ছে জঙ্গলের। পরিবেশের। প্রজাপতিরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে, তাদের পাখায় আগুন। পুড়ে যাচ্ছে ঘাস। আকাশের গায়ে কারা যেন এঁকে দিচ্ছে স্বচ্ছ বারুদের ধোঁয়া। এর মধ্যে বাঁচা যায়। বাঁচতে পারো তুমি ?
>
> কি করব বল ! আমরা যে সৈনিক।
>
> কিন্তু এতে কি বিপ্লব এগোবে ? এভাবে এগোয় বিপ্লব ? পারবে তোমরা সেই কাজটা করে ফেলতে যা তোমরা চাইছ !
>
> দলপতির কথার কোন জবাব দিতে পারেনা বাইশ-তেইশ।'[২১]

বস্তুত রাষ্ট্র বদলের ভাবনা নিয়ে এই যে তরুণ মাওবাদী যুবকের সঙ্গে গভীর জঙ্গলে হাতির কথোপকথন, তা আমাদের এক অন্য মায়াবী জগতে নিয়ে যায়।

উপন্যাসের শেষ অধ্যায়টি জুড়ে লেখক হাতির জবানিতে মনুষ্য প্রজাতির মুখোশ খুলে বেআব্রু করে দিয়েছেন। সভ্যতার শুরুর সমাজ আজকের মানব চরিত্র বিবর্তনের একটি যুক্তিপূর্ণ কালানুক্রমিক চিত্র খুবই লজিক্যাল সিকুয়েন্সে বিন্যস্ত করেছে ওই হাতি। একটু তুলে দেয়া যাক :

> 'যেমন ধরো মানুষ একদম আদিম পৃথিবীতে একা ছিল। তারপর দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সে বুঝতে পারল তুষার যুগ, অভাব, ঝঞ্ঝা, বড় ম্যামথ বা খাঁড়া দাঁতি বাঘের আক্রমণ---এ সব ঠেকাতে তাকে দল বাঁধতে হবে। জোট তৈরি করতে হবে। গড়ে উঠল গোটা সমাজভাবনা।
>
> এই যুক্তিটা কি ঠিক হচ্ছে ? জানতে চাইল বাইশ-তেইশ।
>
> আহা ! শোনই না পুরোপুরি। তারপর নয় কথা বলবে।
>
> বেশ। বলে যাও।
>
> তারপর মানুষ যখন সমবেতভাবে নানা ধরনের মেশিন, প্রযুক্তি, গ্যাজেটস আবিষ্কার করল বহু লক্ষ বছরের সমবেত চিন্তায়, গবেষণার ফলে-পৃথিবীর অন্য অন্য প্রাণীর উপর গড়ে তুললো নিজের নিরঙ্কুশ আধিপত্য, অকারণ হিংসা আর লোভে ধ্বংস করে ফেলল বহু প্রজাতির পাখি, জীবজন্তু, আকাশ, মাটি, সমুদ্র, তখন তার মনে হল এবার সে একা থাকতে পারবে।... চূড়ান্ত ইন্ডিভিজুয়াল। স্বার্থপর।
>
> থামাবে তোমার লেকচার। উফ কি সব রি-অ্যাকশনারি কথাবার্তা। বলতে বলতে বাইশ-তেইশ আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রাইফেলের নল।
>
> এত এক্সাইটেড হচ্ছ কেন ! তোমার এখন কম বয়স। সামনে তত্ত্বের ধোঁয়াশা। এই নিঃসঙ্গতা একলা থাকার ব্যাপারটা তার একান্তই কাম্য ছিল। ইন্ডিভিজুয়াল, চরম ইন্ডিভিজুয়াল। লক্ষ লক্ষ বছরের স্বার্থপরতার আউট বার্স্ট হল। ফেটে পড়লো। রিমোট কন্ট্রোল, হাজার খানেক চ্যানেল, নতুন নতুন গ্যাজেটস নিয়ে মানুষ তার ফ্ল্যাট নামের আধুনিক গুহাঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে সে একাই

থাকতে চায়। তার এই চরম একা থাকার মুহূর্তে সে কখনো কখনো তার স্বামী, স্ত্রী, সন্তানকেও সহ্য করতে পারছে না। মা বাবা ভাই বোন তো দূরের কথা...সবাই ছুটছে টাকার পেছনে। খ্যাতির পেছনে।

তোমার বলা কথার সঙ্গে আমার বিশ্বাস, ভাবনা কিছুই মিলছে না। এসব সভ্যতা বিরোধী প্রকৃতি বিরোধী কথা।

প্রকৃতি ! কিসের প্রকৃতি ! প্রকৃতির সবচেয়ে বড় ক্ষতি যারা করেছে, তারা মানুষ।

এত ঘৃণা, বিদ্বেষ কেন তোমার মানুষদের ওপর ?

তার কারণ আমরা তো হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি মানুষ আসলে কি জিনিস ! কোন ক্ষেতের মুলো।'[২২]

বস্তুত মনুষ্য সভ্যতার দলবদ্ধতা থেকে চরম স্বার্থপরতার এই বিবর্তন, একটি পশুর মধ্য দিয়ে লেখক যে বয়ানে বিন্যস্ত করলেন তা আমাদের চমকে দেয়। এটি জাদুবাস্তবতা। বাস্তবতার বিকল্প বয়ান। একটি হাতির মধ্য দিয়ে এই অনুভবগুলি ব্যক্ত করে তিনি নির্মাণ করলেন অল্টারনেটিভ রিয়ালিটি। একটি পশুর চিন্তাভাবনায় মনুষ্যজাতির মূল্যায়ন আমাদের বিব্রত করে। কিন্তু আধুনিক চূড়ান্ত স্বার্থপর মানুষকে মূল্যায়নের জন্য এর থেকে আর ভালো কি বা হতে পারে !

এটি দুটো সুস্থ মানুষের কথোপকথনও হতে পারত। কিন্তু একুশ শতকীয় চরম ইন্ডিভিজুয়ালের যুগে তৃতীয় পরিসর ভাবনার অবকাশ তাদের কোথায় ? তাতে এ যুগের মানুষের জন্য মূল্যায়নটিও একেবারেই ঠিক হত না। তাই পশুদের মধ্যে হাতিকে লেখক সেই চেতনা দিয়ে দিব্য করে তুলেছেন।

এইভাবে একদিকে দেশভাগের মধ্য দিয়ে বিস্মরণের যন্ত্রণা; অন্যদিকে জঙ্গলকে লোপাট করে প্রাণীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা---এসব কিছুর বিরুদ্ধে যন্ত্রমানবের প্রতি ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের আধারে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে এই আখ্যানটি।

কিন্নরের 'মেঘপাতালে'ও দেখা যাবে হাতি-ঘোড়ার কথপকথন। 'মৃত্যুকুসুমে' দেখা যাবে মৃত মাওবাদীরা বারে বাবে জেগে উঠে আলোচনা করছে রণনীতির। ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের আধারেই যেন গড়ে ওঠে তাঁর আখ্যান।

তৃ তী য় প রি চ্ছে দ

সোহারাব হোসেন : রাজনৈতিক প্রতিরোধী বিদ্রোহের আগুন

এক

ভূমিকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে কোন কোন জীবন, কোন কোন জীবন মাটি ছেড়ে উড়ান দিতে চায় অন্য ভূখণ্ডে। মাটির সোঁদা গন্ধে বুঁদ হয়েই, মাটির জীবন সন্ধান প্রয়াসী এমনি এক মাটির-মানুষের জীবনচর্যা, সাধন-ভজন, ও প্রতিবাদময় উড়ানের আখ্যান সোহরাব হোসেনের (১৯৫৬-২০১৮) 'মহারণ' (২০০৩)।[২৩] সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ঘূর্ণির সঙ্গে বাউলের সাধনা, ফকির বিদ্রোহের অজানা ইতিহাস ও মার্কসীয় তত্ত্বের ত্রিবেণী সংগমের ঘাত-প্রতিঘাতে ম্যাজিক রিয়ালিজমের মিশেলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে রূপকথাময় এক অলৌকিক ভাষ্যের প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনটির বাস্তবতা গড়ে উঠেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার আঁধারমানিক, হাতিপোতা ও শোলমারীর বাম রাজনীতির ক্রমদুর্নীতিপরায়ন, সুযোগসন্ধানী নেতৃবৃন্দ, ও বঞ্চিত কৃষকের প্রাপ্য অধিকার কেন্দ্রিক লড়াইকে কেন্দ্র করে। আর এ লড়াইয়ের নেতৃত্বে থাকে মাটি ও সেই মাটির সন্তান কেয়ামত। আঁধারমানিক গ্রামের উত্তরবিলের দুই হাজার বিঘে মাটির প্রকৃত অধিকার পাওয়া উচিত ছিল কেয়ামতের বাপের। ছলা-কলায় তাকে দখল করে জমিদার তমিজউদ্দিন। মাটি আন্দোলনের ক্ষমতাশীন পার্টি বামফ্রন্টের আঁধারমানিক এলাকায় একনিষ্ঠ কর্মী কেয়ামতের লড়াই মূলত এই উত্তরবিলের মাটি নিয়েই। অথচ তৃতীয় গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস থেকে বামফ্রন্টে চলে আসে তমিজউদ্দিন।

ঠিক এইখান থেকেই পার্টির সঙ্গে সংঘাতে নামে কেয়ামত। যে বর্গা আন্দোলন দিয়ে একদা শুরু হয়েছিল বামেদের ক্ষমতায়ন, আজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারাই হল মাটি বিমুখ---মেনে নিতে পারেনি কেয়ামত ও তার একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী রহিমবক্স। নিজ দলের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায় নির্দলে। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দখল তার লক্ষ্য নয়,

উদ্দেশ্য মজবুত গণসংগঠন করে মাটির ভেতরে শেকড় চারানো। সে কাজে দলের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হলেও, তার মনে বাসা বাঁধতে শুরু করে দাদিমা নূরবুড়ির রূপকথা আর বাউল সাধক ছপুরা। এই দুইয়ের লক্ষ্য ছিল মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে কেয়ামতের আন্দোলনকে জমাট বাঁধানো। বাম ও ডানপন্থী থেকে যখনই কেয়ামতের উপর আঘাত নেমে এসেছে তখনই সে বারবার ফিরে গেছে দাদিমার রূপকথার জগতে; ছপুরার মুখে কথিত অতীত সুদূর অতীতের ফকির মজনু শা'র জগতে। আর দুই জগতকে একতারে মিলিয়ে সে বারংবার মাটি যুদ্ধে উৎসাহিত হয়েছে। কাহিনির ভাঁজে ভাঁজে আখ্যানের সেই রূপ বদল ও বাস্তবতার ভিন্ন মাত্রাগুলো এইবার বুঝে নিতে পারি।

প্রথমে আসি, দাদিমা নূরবুড়ির রূপকথায়। উপন্যাসের বহু জটিল ধাঁধা সমাচার নিয়ে কেয়ামতের বুকে আসন পেতে ছিল নূরবুড়ি। সুযোগ পেলেই নাতিকে সে শুনিয়ে গেছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যত ধাঁধা ও রূপকথা। কেয়ামতের বাপ হেকমতের এক আলোক বালীকার কাছ থেকে সোনার মাছ পাওয়ার রূপকথা। মাছটি স্বর্ণ ব্যবসায়ী তমিজউদ্দিনের কাছে বেচতে গিয়ে পেতল বলে বেহাত হওয়া। সেই মাছ বিক্রি করে উত্তরবিলের দুই হাজার বিঘা জমি দখল দেওয়া। আর এসবের সাক্ষী হিসেবে নূরবুড়ি চায় প্রতিকার, প্রতিশোধ। রাজনীতির ময়দানে যখনই কেয়ামতের পথে এসেছে সমস্যা বা যখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তৈরি হয়েছে দোদুল্যমানতা, তখনই দাদিমা তাকে শুনিয়েছে একটি একটি করে ধাঁধা ও ধাঁধার হাত ধরে পথের জটিলতা ভেঙেছে কেয়ামত।

দাদিমা নূরবুড়ি ছাড়া বাপ-মা হারা কেয়ামতের আর একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয় সাধিকা ছপুড়া। ক্ষমতায়নের তৃতীয় দফায়, সুবিধাবাদী দুর্নীতিবাজ বাম রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে যখনই অস্থির হয়েছে কেয়ামত, মুক্তির খোঁজে দিশা পেতে তখনই সে ছুটেছে সাধক দরবেশ ছপুরার কাছে। লাল পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী কেয়ামত পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে উত্তর বিলের দখল দিতে সে আশ্রয় করে ছপুরার তত্ত্বকে। ছপুরা বলে, 'তোমার রাজনীতিতি তুমি গরিপির এহ জগতের মুক্তি খোঁজ, আর আমার ফকিরিতে আমি গরিপির দেহডারে মুক্তি দিই। ফারাক নিকো।'[২৪] ছপুরার এই গরিবি তত্ত্বের সঙ্গে কেয়ামতের মগজে মিল খাবে মার্কসীয় তত্ত্ববাদ। দুই তত্ত্বকে মিলিয়ে নির্বাচনে সে দাঁড়াবে নির্দলের নৌকোচিহ্নে।

জমি আন্দোলনকে স্থির রেখে কেয়ামত যেদিন পার্টির বিরুদ্ধে গেল, কিছুতেই নিজেকে মেনে নিতে পারেনি। বুঝতে পারছে না সে ঠিক না ভুল ! অন্ধকার ঘরের মধ্যে চোখ বন্ধ করলে পরির বেশে তার সামনে হঠাৎ হাজির হয় ছপুরা। সে প্রশ্ন করে :

> '---কোন্ বীজ ভিয়ান করলে সাধক অমর হয় ?
>
> ---জলকর দখলের লড়াইর বীজ ! রাজনীতির বীজ ! ---ছপুরা থেকে অদৃশ্যে উত্তর দেয়।
>
> ---তুমি বলো কী ছপুরা বু' ! ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্ক ? পির মহম্মদ আলি সাঁই দরবেশ তো এমন নির্দেশ কোথাও দেয়নি ছপুরা বু' ?
>
> ---তার গুরুর গুরুরা দে রেখেছে দরবেশ। মুখ্যু তুমি। তুমি মুখ্যু এখনও।
>
> ---গুরুর গুরু ? সে কারা ? কী তাদের ইতিহাস ?
>
> ---শোনো দরবেশ ফকির-সাঁই-দরবেশরা চিরডাকাল জমির লড়াই করে তবে সিদ্ধ দরবেশ হয়েছে। সব দরবেশের সেরা ফকির কানপুরির মাদার শা। তার শিষ্য সাঁই দরবেশ মজনু শা। শুনেছো তাগা কথা ?'[২৫]

আশ্চর্য এবার ছপুরা কেয়ামতের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটাতে অদৃশ্য থেকে বলে যাবে সেই ইতিহাসের কথা, যখন বাংলা, বিহার কৃষকদের উপর ইংরেজরা অসীম অত্যাচার চালায়---তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা :

> 'সন ১৭৭১ সালের কথা। কানপুর থেকে বাংলাদেশে আসলে সাঁই দরবেশ মজনু শা। মহাস্থানগড়ের দরগায় তারে আটকালে ইংরেজ সাহেব। ব্যাস আর যায় কনে। মজনু শা তখনকার মতো পালালে। তার উপর বাংলার কৃষকের দুর্দশা দেখে ক্ষেপে উঠলেন মজনু শা। অস্তর জোগাড় করলে।... তখন দেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর লেগে গেছে। মজনু শা সরকারি খাজনা, সরকারি খাদ্যশস্য, জমিদারের কাছারি লুট করে লে সব গরিবগুরবোর মধ্যি দান করে দিত। অমর সাধু ভবানী পাঠক ছেল তার বন্ধু ! বুঝেছ দরবেশ ?'

কেয়ামত যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে---'এত কথা জানলো কেমন করে ছপুরা বু' ? সে ছপুরার কথায় মাথা নাড়ে। বলে 'তারপর ?'

---'তারপর আর কি, মজনু শা মরে গেলি তার শিষ্য পিরাগ আলি শা, মুসা শা কৃষকের পক্ষে লড়াই দেলে। তারপর অমর দরবেশ সোভান আলি শা দেলে আন্দোলনের নেতৃত্ব।... তুমি পারবা না তারগা মতন' ?...

---তুমি আমারে শিষ্য করবে ছপুরা বু' ?

---তুমি জমির আন্দোলন কর যেদি তেবেই আমার শিষ্যত্ব নিতি পারবা।...

কেয়ামত এখন চেতন-অবচেতনের মাঝখানে অবস্থান করছে। তার চোখের উপর থেকে ছপুরার দেহাংশগুলো ক্রমে মিলিয়ে গেল। আর বোধহীন তার মুখে বিড়বিড় করে শোনা যেতে লাগলো কিছু শব্দ, কিছু শব্দের অস্তিত্বের মধুরতা : 'মন চলো যাই/ মজনু শা পিরাগ শা সোভান আলি শার দরগায়।'[২৬]

এই হল জাদুবাস্তবতার আলাপন। একদা ইতিহাসের অন্য বাস্তবতাকে হঠাৎ হাজির করে সাম্প্রতিক সমস্যার সমাধানের এই যে উপস্থাপনা---এটাই ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম। জমি আন্দোলনে নেতৃত্বের প্রশ্নে সমস্যায় পড়লেই কেয়ামত এইভাবে চোখ বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বা আকাশের তলে এসে দাঁড়ায় ছপুরার কাছে পরামর্শ নিতে।

এরপর লেখক সুকৌশলে ছপুরার মুক্তিমার্গের সাধনার সঙ্গে বাম রাজনীতির শোষণমুক্ত সমজের এক মায়াবী মিশেল ঘটাবেন। এবং বুঝিয়ে দেবেন যে, সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের জন্য মার্ক্সীয় বিদেশী নীতি প্রণয়নের আগেই নিদান দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের দেশীয় ফকির সাধকেরা।

বস্তুত উত্তরবিল দখলে কেয়ামতের হাজারো সমস্যা। পার্টির বিপক্ষে যারা তাদের সমস্যা, নানা মতের জনগণের সমস্যা, পুলিশি হাঙ্গামার সমস্যা, তমিজউদ্দিনের পোষা লেঠেলের সমস্যা। উত্তর বিল দখলের আগে এত সমস্যার মাঝে পড়ে কেয়ামত নেমে এলো রাতের আকাশের নিচে। চোখ বন্ধ করলো। না এবার ছপুরা না; ছপুরার পথ বেয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সার সার মৃতদেহ। মহাস্থানগড়ের দুর্গে হঠাৎ

ব্রিটিশদের আক্রমণে সব মৃত ফকির। গাছে গাছে ঝুলছে তাদের দেহ। কারো চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, কারো পেট দু'ফাক, কারো মুখ বেয়নেটে থেতলানো। সেই বিজন মৃত্যুপুরীতে হাজির হল কেয়ামত। ছুটতে লাগল। ছুটছে আর এক-একটা মৃতদেহ ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর বলছে :

---'বল হে গুরু ভাই তোমরা এমন করে মৃত্যুবরণ করলে কেন ?'।...

---'বল দরবেশ এমন করে মরার সাহসমন্ত্র তুমি কোথা থেকে পেলে ? বলো উত্তর দাও।'

---ষাট পারা গোপ্তো কোরানের ভেদ ভাঙার জন্য আমি মরেছি হে গুরু ভাই---চোখহীন এক দরবেশ উত্তর দিল।

---তুমি ? তুমি কি জন্য মরেছ হে দরবেশ ? কেয়ামত আর একটা গাছের কান্ড পাঁজিয়ে ধরে।

---আমি ? জমি-মা, মাটি-মাকে উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিয়েছি হে গুরু ভাই- কোমরের নিচে থেকে অঙ্গহীন একটা লাশ উত্তর দেয়।...

---আর তুমি ? তুমি ? কেয়ামত আর একটা গাছের কাছে একটু গেঁড়ে বসে।

---নিজেরে সত্যসাঁই করতে। সবার উপাস্য যে অটল সেই মহাবস্তুকে বাঁধতে শেখার জন্য।...

---এত সাহস, এত ত্যাগ, এত উৎসর্গ তোমাদের ? ---ঝুলন্ত মৃতদেহের মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে কেয়ামত চিৎকার করে জিজ্ঞাসা রাখে।

---হ্যাঁ, হ্যাঁ গো নবীন গুরুভাই। এই ভাণ্ডের যে নব্বই হাজার বাতিনি আছে তার সেরা ছেকরা হল এই বাতিনি। মাটির প্রতি, দেশের প্রতি ইমান আনা। মোরশেদ মজনু শা আমাদের তাই শিখিয়েছেন।---সব ক'টা বিদ্রোহী ফকিরের লাশ যেন একসঙ্গে ফুকার দিয়ে উঠল।

---তোমরা পেরেছ আমি কি পারব না ? পারব না তোমাদের মত ত্যাগী হতে ? মাটির প্রতি ইমান রেখে এই জলকরের দখল নিতে ?

---পারবে। আগে খোদ্‌কে চেনো।

---খোদ্‌ ? কেমন করে খোদ্‌কে চিনব ?

---মোরশেদের দেখানো পথে।...

---কই ? কোথায় মোরশেদ ?...

কেয়ামত চোখ খোলে। আবার বোজে। অমনি তার সামনে থেকে পঁচিশ ফকিরের লাশ উধাও হয়ে যায়। পরিবর্তে সে যা দেখতে পায় তার মুর্শিদকে। ছপুরাকে।...কেয়ামত ভাবতে থাকে চোখ বুজে'[২৭]

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের সেই লড়াইয়ের কথাই এবার জনে জনে প্রচার করবে কেয়ামত। এ যুগের দানবদের বিরুদ্ধে লড়ার প্রচন্ড শক্তি তারা এবার আয়ত্ত করে ফেলে। নির্দলে দাঁড়িয়ে সে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। পার্টির ওপর তলার নির্দেশে সে জমি আন্দোলনের ছাড়পত্র পায়। এবার সে বিল দখল দেবে। কিন্তু কোন পথে ? তার মনে পড়ে ১৭৭০ সালে মজনু শা'র দলে দলে ভাগ হয়ে ভোর রাতে সেনা ছাউনি আক্রমনের কথা। সেই পথেই বহু দলে ভাগ হয়ে ভোর রাতে দখল নেয় বিলের। আজ তার তিন পুরুষের স্বপ্নের সফল হওয়ার দিন। এক অপার্থিব আনন্দে কেয়ামত মাটিতে নত হল। মাটিকে জড়িয়ে ধরতেই সে ছপুরাকে অনুভব করল। অমনি ছপুরা বলে উঠল,-'দরবেশ তুমি এখন সাঁই হয়েছ। এবার আসমানে দ্যাখো।' কেয়ামত আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। মুখমুখি দাঁড়িয়ে কার্ল মার্কস ও মজনু শা :

'---লাল সেলাম কমরেড---বললেন মার্কস---তুমি পেরেছ।

---এসো বুকে এসো সত্যসাঁই---মজনু শা বললেন---তবে এখনও অনেক পথ বাকি।

---সাবধান ! ---মার্কস ও মজনু শা একযোগে বললেন।

---মানে---কেয়ামত হকচকিয়ে যায়।

---দেশে দেশে বস্তুবাদীরাজ ভেঙে যাচ্ছে। শক্ত করে হাল না ধরলে জলকরের মালিকানা ফের কিন্তু মুষ্টিমেয়ের হাতে চলে যাবে। তোমার আশেপাশে অনেক চোরাগোপ্তা আছে। তাদের থেকে সাবধান ! ---কার্ল মার্কস সাবধান হাঁকেন।...

---বিদেশের নেকড়েরা আমার হাজারো সন্তানকে খুঁচিয়ে মেরেছিল।... তোমার এ কাজেও দাগা আসবে। তাই সাবধান। মজনু শা হুঁশিয়ারি হাঁকেন।...

আকাশে দাঁড়িয়ে কার্ল মার্কস ও মজনু শা কেয়ামতের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। কেয়ামত তাদের উদ্দেশে কী একটা বলতে গিয়েই থেমে যায়। কেননা আকাশ থেকে ততক্ষণে দুজনে উধাও হয়ে গিয়েছেন।'[২৮]

এই হল জাদু বাস্তবতার বয়ান। কেবল সমস্যার সমাধানের জন্যই যে লেখক অতীত বস্তবতাকে হঠাৎ করে তুলে আনেন তা কিন্তু নয়; আগাম বিপদের কথা বলেও সাবধানী বাণী শোনান একটা সমস্যাহীন ভবিষ্যতের জন্য।

বস্তুত এই বয়ানের সুত্র ধরে তিন বছর পরে দেখব গ্রামের মানুষগুলো টাকার লোভে তমিজকেই তাদের পাট্টা দলিল বেচে দিচ্ছে। কেয়ামতের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তার এত সংগ্রাম এত সাধনা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জাঁতাকলে পড়ে সব শেষ হয়ে গেল ! তার ওপর বন্ধু রাসেকের সাথে মাওবাদী যোগাযোগের দোহাই পেড়ে দল তাকে বহিষ্কার করল। তার জীবনটা আবার আঁধারে ভরে গেল। ছপুরা নেই, পার্টি নেই, একরাশ হতাশা নিয়ে সে একা উত্তর বিলে এসে দাঁড়ায়। বিলে তখন ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। সেই শব্দের রূপ ধরে হাজির হয় মজনু শা :

'---পথ পেলে দরবেশ ?

---না মোরশেদ। পথ পাচ্ছিনে ! আমার পথ বলে দেন !

---ছদ্মবেশ নাও ! এমন দলাদলির মাঝখানে ছদ্মবেশীই হবে তোমার একমাত্র পথ !

---মানে ?

---একতারারে ছদ্মবেশ করো। ...একতারার গান ধরো। মানুষকে ভালোবাসো। মানুষ এখনো তৈরি নয়। ওদের তৈরি করো !

---আমি কি পারব মোরশেদ ?

---পারবে ! ছদ্মবেশ নাও ! হোজরা গড়ো, মানুষ গড়ো।'[২৯]

কেয়ামত আবার দিশা পেল। নতুন করে সংগ্রামের রসদ পেল। ফিরে এল বাড়িতে। নিল ফকিরের ছদ্মবেশ। এমনি করে চলতে লাগল। এর মধ্যে পৌঁছে গেল

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী রাজের চতুর্থ পঞ্চায়েত নির্বাচন। সারা রাজ্য জুড়ে নেমে এল দাঙ্গা। জ্বলে উঠলো আগুন। মানুষ মরতে লাগলো কাতারে কাতারে। উত্তরবিলে যখন আগুনের শিখা দেখা গেল, তখন গভীর যন্ত্রণায় নিজের স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতায় কেয়ামত কাতরাতে লাগলো। এমন সময় বগার রূপ ধরে তার কাঁধে এসে বসলো মার্কস :

'---কি ভাবছো কেয়ামত ? মনটা বিষাদ কেন ? মার্কস নামের বকটি প্রশ্ন করে।

---বিষাদ হবে কেন ? জমির আন্দোলন করে পার্টিডারে মনের মতন করে গড়ব ভেবিলুম। সেডা পারলুম কই ? এর পার্টিতিই আমার জায়গা হোল না। তাই মনডা বিষাদ।

---তাড়াও তাড়াও ওরে। মন বিষাদ ঢুকলে কিছু হবে না। তোমারে বিষাদ মানায় না।...

---হ্যাঁ কিন্তু ক্যানো হয়। এরাম ক্যানো হয় ?

---না হবে কেন ? দুনিয়া জুড়ে নীল পরিরা ওত পেতে থাকে। ওরা সব এক একটা বড়োবড়ো পুতুলনাচের দলের মালিক। দুনিয়া জুড়ে পুতুল নাচায়। সুতো ছাড়ে। সুতো গোটায়। সরকারে পুতুল বসায়। সুতোর টানে দাঙ্গা বাধায়। কেশপুর-গড়বেতা করে। সেই ফাঁকে ব্যাংকের আমানত কেনে, পুতুল নাচিয়ে জনতার স্বল্প-সঞ্চয়ে সুদের হার কমায়, যাতে তাদের অনুগৃহীত পুতুলরা সরকার থেকে কম সুদে ঋণ পেতে পারে। সে ঋণ তারা কখনো শোধ করে না। বিনিময়ে নিজেদের ঝোলা থেকে সামান্য দানা ছড়িয়ে গাঁ-গ্রামের আরও ক্ষুদ্র সব জোতদার-ব্যওসাদার পুতুলগুলোর সামাজিক কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

---সে তো করে নীল পরিরা---কেয়ামত মার্কসকে চেপে ধরে---এদেশে তো লালপরিদের রাজত্বি। তবে ?

---তবে কী ? দিনের ফেরে এরাও এখন ওই একই হাতের সুতোর টানে নাচছে।

---ক্যানো ? কী করে ?

---রাক্ষসবাদের পুতুল হয়ে।... রাষ্ট্রের পোকা তোমাদের লাল পরিদেরকেও আক্রমণ করে।

---কী সেই পোকা ? কেয়ামত ঘোরলাগা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা রাখে।

---এ পোকার চার রূপ---ক্ষমতালিপ্সা, প্রভুত্বকামীতা, আত্মস্বার্থ আর ভোগবাদী জীবন।...

---সত্যি ?

---হ্যাঁ সত্যি. তোমার লাল পরিরা, সে রাশিয়ার হোক বা তোমার পরিরাজ্যে হোক, ক্ষমতায় এসে মেদবৃদ্ধিতে মেতে উঠলো। থানাকে নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে, থানাতে বসে শ্রমিকদের অসন্তোষের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে, প্রায়শ জনগণকে আন্দোলনবিমুখ করল। ঠিক হিটলারের গ্রে-হাউন্ডের মতো।

---এখন উপায় ? সারা দুনিয়ায় তো লাল পরিরা এ পোকার কামড়ে মরে যাচ্ছে।

---উপায় একটাই। ফের শুরু করা। লাগসই টিকা নিয়ে।'[৩০]

অলৌকিক রূপকথা জগতের হাত ধরে এই হল বাস্তবতার অভিনব বয়ান। একুশ শতকেও একটি সাধারণ কৃষক পরিবারের সমস্যার সমাধান করতে, লেখক হঠাৎ করে তুলে আনলেন প্রায় দু'শো বছর আগেকার ভিনদেশীয় আরেক সমাজবাস্তবতা। মার্কসীয় বস্তুবাদ। স্বয়ং মার্কস এসে কেয়ামতের মত একজন বর্গাদারকে পথ দেখাচ্ছে। এই হল আধুনিক বয়ান। এই হল ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম।

এইভাবে মজনু শা'কে বুকে রেখে আর মার্কসকে মস্তিষ্কে রেখে, কেয়ামত সলতে পাকাতে থাকে নতুন করে সংগ্রামের জন্য। কারণ সে জেনে গেছে, এই দুটো পথের কারবার বস্তু নিয়ে। পুঁজিবাদী ভোগ-বিলাসের, লোভ-লালসার মুক্তি নিয়ে। মানুষকে এই গোড়ায় গলদ থেকে মুক্ত করে, নতুন করে মানুষ তৈরির কাজে লেগে পড়ল। কেননা এবার যে লড়াই সে দেবে, তার মধ্যে কোন খাদ রাখতে চায় না। থাকবে নিখাদ বস্তুমানুষ লালসাহীন মানুষ, সংগ্রামী মানুষ, স্বার্থহীন মানুষ।
জাদুবাস্তবতার অভিনব বয়ানেই সে পেল এই নতুন পথের ঠিকানা।

দুই

গ্রামকেন্দ্রিক লোকায়ত ঢঙে সোহরাব হোসেনের আরেকটি জাদুবাস্তবতাধর্মী কথামালা 'সরম আলির ভুবন' (২০০৪)।[৩১] লেখকের মাতৃভূমি সংবেড়িয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর মিস্ত্রীর বহুস্তরিক সহমর্মিতা, প্রতিবাদ চেতনা ও মাটি কামড়ানো মানসিকতার আদলে গড়ে তোলা সরম আলির মায়াবী ভুবন আমাদের ভাবনার এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। দারিদ্র্য তার নিয়তি, এই বোধ প্রথম থেকেই সে মেনে নিয়েছে ঠিকই; কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেনি কোনদিন। চতুর্দিকে হায়ানার মাঝে থেকেও সে নিজের সিদ্ধান্তে থেকেছে অটল।

এখন প্রশ্ন একজন সাধারণ মূর্খ গরিব যুবক হার না মানা মানসিকতা আর এত শক্তি পেল কোথায় ? দুবেলা পেট ভরে খাবার রসদ যার নেই, তদুপরি মাথার উপর চার ছেলে-মেয়ের সংসার তার মেরুদণ্ড এত শক্ত হয়ে ওঠার রসদই বা কি ? এই সত্য অন্বেষণে বেরিয়ে আমরা দেখতে পাব, লোকটির ছিল এক অদ্ভুত অনুভবী ক্ষমতা, জিন-পরিদের সাথে সখ্য গড়ার এক কাল্পনিক কাহিনির প্রচার---যাতে লোকে তাকে ঘাটাতে সাহস না পায়। স্মৃতিতে ধরে রাখা সাত-পুরুষের বিজয়-বৈজয়ন্তী গাথা, গল্পের ভেতর গল্প বলে জনগণকে বুঁদ রাখার এক অদ্ভুত সম্মোহনী ক্ষমতা, নিজেকে আদিম বন্য-প্রকৃতির জীব মনে করে গাছ-গাছালি, পশু-পাখি প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের মত কথা বলার অলৌকিক ক্ষমতা---তার বাহুবল ও মনোবলকে বাড়িয়ে দিয়েছিল হাজার গুণ বেশি। আবহমান কালব্যাপী বয়ে চলা গ্রাম্য লোককথা, রূপকথা কিংবা দিশেহারা হলে ঘুমোঘোরে স্বপ্নের কথকতা---তার স্মৃতিকে সর্বদা সতেজ রাখত। বস্তু মানুষের এই অবস্তুক ভাষ্যগুলি কারো অলৌকিক মনে হতে পারে; কিন্তু দুনিয়াজোড়া দখলদারি, রিরংসা আর রাহাজানির মাঝখানে বাঁচতে গেলে, অবচেতনার এই ধারাপাট স্মৃতি, স্বপ্ন ও লোকগল্পের উপস্থাপনা বা মৃত মানুষের সাথে কথোপকথনে বাঁচার নতুন ঠিকানার সন্ধান---সেও তো এক ধরনের বাস্তবতা। মানব জীবনের হিমশৈলের মতো তা ডুবে রয়েছে বলে তাকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু বুঝে নিতে হয়। 'সরম আলির ভুবন' উপন্যাসে বাস্তবের এই অভিনব বিস্তারকেই আমরা বলব জাদুবাস্তবতা।

আখ্যানের বিস্তার ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠেছে নটেখালি গ্রামের মান্নার আমবাগানকে কেন্দ্র করে। কলকাতার মান্নাবাবুর বাগানটি লিজে নিয়েছে নটেখালির রহমান। ঐ লিজের আরো দুই অংশীদার জুল্লাল ফকির ও সরম। রহমানকে উৎপাটিত

করতে এই দু'জন বারবার হামলা চালিয়েছে বাগানে। নিরুপায় রহমান তখনই বাগানে গার্ডম্যান হিসাবে নিযুক্ত করে গ্রামের বেকার, মূর্খ গরিব সরম আলিকে।

বাগানটির বিস্তার প্রায় চল্লিশ বিঘের আশেপাশে। তাকে রক্ষা করা তো অসম্ভব ব্যাপার। তাই সরম আলি বাগান রক্ষা করবার এক অদ্ভুত কিসিম গড়ে তুলেছিল প্রথম থেকেই। জিন-পরি-আতুসির স্বপ্ন গড়া গল্প। গল্পের শুরু থেকেই শুরু হয় এমনই এক বিকল্প প্রতিরোধী বয়ান। কিন্তু রূপকথার এই অলৌকিক গল্প দিয়েও সে বাগানকে জুল্লালের এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। গভীর রাতে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয় বাগানকে। কিন্তু ঘাতক কে তার সন্ধান আর খুঁজে পায়না কেউ। তখনই হুরি-পরির স্বপ্নমাখা ঘোর নিয়ে সরমের কথা বলা শুরু হয় কেটে দেওয়া ডালপালার সঙ্গে। একে একে কথা বলে হিম সাগরের কাটা ডালের সঙ্গে, ফজলি আমের কাটা ডালের সঙ্গে।

গাছ-মানুষের এই অলৌকিক কথাবার্তা আপাতভাবে মনে হবে অবাস্তব। কিন্তু টাকা-পয়সার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদ যখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে, আর তার পাশে বিষফোঁড়ার মতো ঢুকেছে পার্টি-পলিটিক্স---সেসবের মোকাবিলা করার ক্ষমতা সামান্য সরমের এর পক্ষে অসম্ভব। তাই তার নিজস্ব ঢঙে মায়াময় ছায়াঘেরা বাগানের এক কাল্পনিক সংবদল রচনা করতেই হয়। না হলে সে বাঁচবে কেমন করে ?

কিন্তু বাস্তবের সরম বোঝে এই বাগান কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বময়তায় মাথা গলালে সে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। অথচ তার হার না মানা মনটা একটা লড়াই দিতে চায়। কিন্তু সে কেমন করে বাগানকে প্রতিরোধ করবে বুঝে উঠতে পারে না। এমন সমস্যার সম্মুখীন হলেই স্মৃতির সরণি বেয়ে সোজা চলে যায় তার মৃত চাচা তোরাপ আলির কাছে। চলে যায় অন্তত দু'শ বছর আগের ইতিহাসের কথায়। যেখানে সে বুঝে নিতে চায় বাগান নিয়ে গোড়ায় গলদখানির কথা। স্বপ্নের ঘোরে সে জানতে পারে সাত পুরুষ আগে সরমের বংশধর সত্যদাস সর্দার ওই বাগানটি মৌখিকভাবে দিয়েছিল তারমামুন মান্নাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে সরমেরই মালিক হওয়ার কথা। অথচ কপালের ফেরে আজকে সে সেই বাগানের সামান্য চৌকিদার। হায় মানুষের ভাগ্য ! কিন্তু সরমের এখান থেকেই শুরু করতে চায় তার জীবনের যুদ্ধ। উত্তরাধিকারের এই স্বপ্নের পর সে এখন বুকে প্রচুর বল পায়। যেমন করেই হোক বাগানটা তাকে রক্ষা করতেই হবে।

ডাল কাটা নিয়ে থানা পুলিশ হলেও, তার মধ্যে রাজনীতি ঢুকলে সব পক্ষই দায়ী

করল চৌকিদার সরমকে। কেননা সেই বাগানের দেখভালের দায়িত্বে। অসহায় গরিব মানুষ হিসেবে সরমের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কোন উত্তরই যখন তার কাছে নেই, তখন লেখক এক অদ্ভুত মায়াবী সংলাপ রচনা করেন ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির সঙ্গে সরমের :

> '---দিন দুনিয়া বড় বে-এনসাপ হয়েছে রে ভাই।
>
> ---ঠিক বলিছিস তোরা ঠিক বলিছিস। ভালো হবে না। মুখে রক্ত ওঠপে।---সরম তাল-বেতালে রা কাড়ে।
>
> ---ফলবতী গাছগুলোরে কাটলি তোরা ? এটা কি মানুষের পরিচয় ?
>
> ---হাত পা পড়ে যাবে। ধম্মে সবে না। রাগারাগি রয়েছ তোগা মধ্যি রয়েছ। তা বলে সেডা কি ঐ গাছগুলোর ওপর ফলাতি হবে ?
>
> ---বুঝতে পারছো না এ রাজনীতি। রাজনীতিতে খেলো দেশটারে।
>
> ---শালার রাজনীতির পাছায় মুতি ! রাজনীতি করতে গে দয়া, ধম্ম সপ ত্যাগ করতি হবে ? বে-এনছাপ মানুষ হতি হবে ? ফলবান গাছ আর পয়তি নারী একই কথা। পারবি কেউ নিজের পয়তি বো'র ঐরাম করাতের পোঁচ বসাতি ?
>
> ---পারবে। আজকাল সব পারে মানুষ !
>
> ---তবে মা অন্নবতী তুই সবাইরে টাইট দেনা কেন ? সপ শালার পেছন চুলকানি হয়ে যাক ! দে মা অন্নবতী তুই শোরের পো গুনোরে বল্টু-টাইট দে।
>
> টগবগানি ভাত-ফোটা হাঁড়ির সঙ্গে কথাগুলো বলে সরম আলি অপলক চেয়ে থাকে। হাঁড়ি আর কোনো কথা বলে না। শুধু টগবগ করে ফুটতে থাকে। তা দেখে সরম আগ্রহ ভরে বলে :বল বাপ হাঁড়ি কথা বল। এই বিশ্বাসঘাতক শোরের পো গুনোরে টাইট দেবার মন্ত্র বলে দে।'[৩২]

এই সংলাপটি আমাদের মনে হবে অলৌকিক। কিন্তু 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়' এমন প্রতিষ্ঠিত প্রাবচনে গরিবের পক্ষে রায় কোথায় ? তার বাঁচার রসদ কোথায় ? হয়তো তাই এ কালের লেখক সোহারাবকে তীব্র প্রতিরোধী বয়ান লিখতে হয়। নির্দোষ মানুষকে ভিন্ন পথে বাতলে দিতে হয় তার প্রতিবাদী মানসিকতাকে। তাছাড়া সমাজের পয়সাওয়ালা মানুষ থেকে শুরু করে পুলিশ-প্রশাসন,

পার্টির বড় লিডার---এদের মুখোশটা সরাসরি খুলতে সবার তো সাহস থাকে না, থাকার কথাও নয়। তখন রূঢ় বাস্তবতার অন্য এক ফের রচনা করতে হয়। এই অলৌকিক কথাবার্তা থেকে রসদ পেয়ে সরম একে একে মোকাবিলা করে পার্টির বড় বড় মেম্বারদের সাথে, থানার দারোগার সাথে, জিন হাসেল করা মৌলবীর সাথে। এককথায় পুরো বেইনসাফ সমাজের সাথে।

উপন্যাসে সরম আলি যে মানুষটিকে জব্দ করতে প্রথম বেগ পায়, সে বড় অংশীদার রহমান। কেননা তার পেছনে আছে পার্টির বড় মেম্বার। আর মেজো অংশীদার জুল্লালকে। কেননা তার পেছনে আছে পার্টির ছোট মেম্বার। বাগান থেকে সরমের উচ্ছেদ আর তারিকুলের নতুন গার্ডম্যান হিসেবে নিযুক্তকরণ ঘটনার মধ্যে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়ের। বাগান চৌকিদারের কাজ থেকে উৎখাত হয়ে সরম যখন অর্থদৈন্যতার গভীর সংকটে কিংকর্তব্যবিমূঢ়---তখন লেখক তার মতো গরিবকে আশ্বাস দিতে রচনা করেন এক স্বপ্নের মায়া। সে স্বপ্নে সংকটের কিনারা করতে এক সাদা আলখাল্লা পড়ে হাজির হয় তার মৃত তোরাপ চাচা। তাকে দেখে সরমের ব্যাকুল প্রশ্ন :

> '---কি হবে চাচা ? ভীষণ বেপদ।
>
> ---বেপদ ? কীসের বেপদ ? কার বেপদ ?
>
> ---আমার রুটি-রোজকারের বেপদ। ওরা আমারে বাগানথে লেবগে দেছে।
>
> ---ওহ এই কথা ? এ কিচ্ছু না !
>
> ---মানে ?
>
> ---মানডো আবার কী ? লেবগে দেছে, দেকগে।
>
> ---মেনে লেবো ?
>
> ---তা লিবি কেন ?
>
> ---তেবে ? কী ক'রবো ?
>
> ---লড়াই।
>
> ---লড়াই ? ওরগা সুঙ্গে ? পারবো ?
>
> ---না পারার কী আছে ? তুই এলাকা পত্তুনিদার তারমামুনের বংশধর। ফের সেই বাগান পত্তুনিদারেরও বংশধর। তার উপর ঐ

হাট পত্তুনিদারের উত্তরপুরুষ ! তোর রক্তে লড়াই আছে। লড়াই দে !

---দেবো ?

---হ্যাঁ দিবি।

---কী করে ?

---সে তুই হিসেব করে লে। কোন পথে লড়াই দিলি খেলা জমবে, ম্যাচ জেতা যাবে---সে সব তোরেই হিসেব কোরে লিতি হবে !

---আম পাড়বো ?

পারবি।'[৩৩]

আসলে পৃথিবী স্বার্থমগ্ন। তাই কোনো সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহস দেবার বা পথ বাতলে দেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। তাই লেখককে অত্যন্ত সুকৌশলে আনতে হয় সরমের মৃত পূর্বপুরুষকে। মৃত মানুষের সাথে এই কথাবার্তা তাই অলৌকিক লাগেনা।

সরম লড়াই দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তোরাপ চাচা বলেছিল নেতা তৈরির প্রথম কথাটি। মানুষের জন্য লড়াই দিতে গেলে মানুষকে সংঘবদ্ধ করা দরকার। মিটিং মিছিল করা দরকার। তবেই হাজার মানুষের মিশেলে মানুষের কলজের জোর বাড়ে। তার মনে পড়ে যায় তোরাপ চাচার বলা খাসাকুঁড়ের গল্প। সমাজের করাপটেড অসুস্থ মানুষগুলোকে জব্দ করবার জন্য এবার সে দ্বারস্থ হয় রূপকথার বগা-বগীর কাছে। আবেদন জানায় একটি হাঁড়ি ও মুগর পাওয়ার জন্য।

'---কেডা ? কি চাস ?

---চাই সেই জাদু-মুগুরখান আর জাদু-হাঁড়িখান।

---ধুস্, সে কি আর আছে এখন ! সে সব সত্য যুগের কথা ! তুই অন্য কিছু চা।

---না ঐ মুগুর আর হাঁড়িখান আমার চাই !

---কী করবি তুই এ হাঁড়ি-মুগুর নিয়ে ?

---মুগুর দে শালা বড় মেম্বাররে ধোলাই দেবো, বাগান মালিকরে শায়েস্তা করবো আর রাব্বানী মেম্বার আর জুল্লালরে মেরে মেরে হাড়ে-মাসে এক জায়গায় করে ছাড়বো।

---আর হাঁড়ি দিয়ে ?---বগলের তলা দিয়ে মুখ গলিয়ে বগী জিজ্ঞাসা করে।

---হাঁড়িডা লে শালা এদ্দিনির উপোশলাগা প্যাটগুনোরে শান্ত করবো। ইচ্ছা মতোন গোস্তো-গরমি কোপ্তা-কাবাব খাবো !

সরমের কথা শুনে বগা-বগী চোখাচোখি তাকায়। ইশারায় কী সব কথা বলে। শেষতক বগী সরমকে জানায়---যা হুই বাদশা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে তপস্যায় বোস। সপ পাবি'[৩৪]

এইভাবে নেতা তৈরির দ্বিতীয় সংকেতটিও সে পায় অলৌকিকতার হাত ধরে।

এইসব বয়ানগুলো আপাতভাবে মনে হবে অবাস্তব; এ লেখকের স্বতঃপ্রণোদিত একটি ফাঁকি। কিন্তু অননুপায়ান্তর হয়ে লেখক নির্মাণ করছেন এইসব গালগপ্প। কিন্তু সমাজের এই প্রচন্ড শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে একটি তৃতীয় বিশ্বের গরিব মানুষের পক্ষে লোককথা, স্বপ্ন আর রূপকথা ছাড়া কিই বা আছে ! নিজস্ব এই সংহিতা দিয়েই সোহরাব হোসেনের মতো লেখকদের রচনা করতে হয় সাধারণের কণ্ঠে বিপ্লববাদের বিদ্রোহী গাথা।

আমরা দেখব, বগার কথা মোতাবেক এবার সরম আলি মুসাফির হয়ে ঘুরে বেড়াবে মানুষের দরজায় দরজায়। মানুষের গরিবীয়ানার বিচিত্র রূপ দেখে যখন সে আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে আবার স্মরণ নেয় তোরাপ চাচার। স্বপ্নের তোরাপ চাচা এবার তাকে শোনাবে এক সাদা দরবেশের গল্প। সেই গল্পের সূত্র ধরে এবার সে বগার কাছে চাইবে এক মুগুর---যা দিয়ে সে অন্যায়কারীদের জব্দ করবে। আর দ্বিতীয় কাঙ্ক্ষিত বিষয়, এক দাড়িওয়ালা বুড়োর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। এই জায়গাটি লেখক জাদু-বাস্তবতার মায়াবী অঞ্জন দিয়ে নির্মাণ করেছেন। বর পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে ডাকলো বুড়োকে। বুড়োটি আর কেউ নয়, কার্ল মার্কস :

'---ওহে বড় মেম্বারের বাড়ির দারিয়ালা একবার সামনে আয়দিনি বাপ। তোর সুঙ্গে আলাপ পত্তর করি। দেখি তোর দ্বারা লড়াই-টড়াই হবে কি না বুঝে লেই'।

ব্যাস আর যায় কোথা ! বড় মেম্বারের বাড়ির দেওয়াল থেকে ঝুলি-ঝাম্পা পরা গোলগাল মুখের দাঁড়িয়ালা এক্কেবারে সরমের সামনে হাজির। সরমের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। কী যেন হয়ে যায়।

আপনা-আপনিই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় অচিন দেশের শব্দাবলী---'ইনক্লাব জিন্দাবাদ, সব খবর ভালো তো কমরেড ?'

সরমের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরো মান্নার বাগান কাঁপিয়ে দাড়িয়ালা বলে ওঠে : 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ। বল কমরেড তোমার জন্য আমি কী করতে পারি ?

---দাঁড়াও দাঁড়াও তোমারে আগে প্রাণভরে এট্‌টুস দেখে লেই। আলাপ-উলোপ জমাই। তার ফেরে তো কাজের কথা। আচ্চা তোমার নামডা কী বলোদিনী ?

---আমার নাম ? শুনবে ? আমার নাম হল কার্ল মার্কস।

---কী বললে ?

---মার্কস। মার্কস সাহেব।...

---শোনো তোমার কাজ হবে মুগুরির। এইসব নেতা-হাতা সপ একপেশে হয়ে গেছে। তারগা ফাঁদের বহার খুব চওড়া। আমার গেরামবাসীরা দুই মেম্বারের দাপটে যে মরে গেলুম। পিতিকের করার কেউ নিকো !

---হুম !

---হুম কী ?--- সরম সামান্য বিরক্তি দেখায়।

---আমি ওসব জানি !

---ব্যাস তালিই হবে। তোমারে য্যাখন যার কাছে পাঠাবো রাত্তিরি চুপিসারে গে নেতা-হাতাগা ঘুমের মধ্যি তুমি আচ্ছা কসান্ কস্‌কে দ্যাস্‌পা বুঝলে ? এদ্দম ঐ বগা-বগীর মুগুরিরপা মতো ! পারবা ?

---পারবো।

তবে যাও আজ রাত্তিরিই বড় মেম্বার ছোটো মেম্বারের বাড়িতি যাও।...দু'জোনারে বেস করে কোড়কে দেসো দিনি।

সরমের হুকুম পাওয়া মাত্র দারিয়ালা কমরেড কার্ল মার্কস এক লহমায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বাগানের ডালে-পালায় হিন্দোল ওঠে। ডালপালারা যেন বলে ওঠে---'সরম আলি---জিন্দাবাদ'[৩৫]

আপাত অবাস্তব মনে হলেও এই কথোপকথন আমাদের মোটেই বিসদৃশ লাগে না। বাংলায় সিপিএম পার্টির অন্দরে দীর্ঘদিনের শাসন কায়েম করা কমরেড গুলোর ঔদ্ধত্য, অহংকার, গরিবকে মারার পরিকল্পনা, ধীরে ধীরে সঞ্চিত হওয়া পুঁজিবাদী মানসিকতায় কষে ঘা দেওয়ার সত্যিই ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যে মার্কস সারাজীবন সাম্যতার গান গেয়ে গেছেন, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, গরিবের উত্থানের জন্য স্লোগান দিয়ে গেছেন; তার অনুসরিত পথ ধরে ক্ষমতায় এসে পার্টির মেম্বাররা আজ সেইসব বাণীর কথা ভুলে যখন স্বার্থ কায়েম করতে ব্যস্ত; তখন সেই মার্কসকে আর একবার জীবিত করে সমাজ শোধরাতে নেতা বানানোর মন্ত্রণা দিতে প্রয়োজনই ছিল। বড় মেম্বার নয়, ছোট মেম্বার নয় নটেখালি এবার দেখবে মার্কসের হাতে গড়া নতুন এক গরিব নেতাকে। সরম আলি। যে মানুষের সংগঠন করে, মানুষের দৈন্যতার পাশে, দুঃসময়ের পাশে লড়াই দিয়ে দাঁড়িয়েছে। নটেখালির নতুন দিনের সূর্য হয়ে ওঠে সরম আলি।

এইভাবে একজন সাধারণ গরিব বাগান চৌকিদার থেকে স্মৃতিতে ধরে রাখা সাতপুরুষের বীরত্ব কথা শুনতে শুনতে, মৃত তারিকুলের সাথে কথা বলতে বলতে, রূপকথার বগা-বগীর হাত ধরে, তোতা-শালিকের মত নিয়ে, মৃত তোরাপ চাচার নানা সূত্র বেয়ে, গ্রামের এক যুগ আগে হারিয়ে যাওয়া যাত্রাপালা 'রাখাল রাজার' নতুন অভিনয় কৌশলে নেতা বানাবার সূত্রগুলি আয়ত্ত করে, সর্বোপরি মার্কসের ডাইরেক্ট উপস্থিতিতে---সরম আলি এমন এক নেতা তৈরি হয়---যে বড়লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এক বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে। হাজার হাজার গরিবকে সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। একসূত্রে সহস্র প্রাণ এক হয়ে উঠল বলেই গ্রামের ঐতিহ্য মান্নান বাগান আর কোন প্রোমোটারের হাতে গেল না। রইল গ্রামেরই মানুষের হাতে। আর কোনো সাম্প্রদায়িকতা রইল না। রইল না কোন বিরুদ্ধ গোষ্ঠী। গ্রামের উন্নয়নের চাকা তরতর করে গড়াতে লাগল।

এইভাবে লেখক আসলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামের নেতা তৈরির সূত্রগুলি অতি সংগোপনে বপন করলেন। আখ্যানের মধ্যে ঐতিহ্য, রূপকথা, স্বপ্ন, লোকায়ত সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার করে একত্রিত হওয়ার এমনই এক মন্ত্র ছিল---যা আপাতভাবে অলৌকিক মনে হলেও সংকটময় বাস্তবতায় তা আসলে বাঁচবার অক্সিজেন দেয়। আখ্যানের এমন মায়াবী বুননে লেখক সময়কে নিয়ে, সংস্কৃতিকে নিয়ে, এমন দক্ষ জাদুকরের মত

খেলেছেন যে, কোনটিই আমাদের কাছে আর অলৌকিক লাগে না। মনে হয় এক রকমের বাস্তবতা---যেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে দুর্নীতি মোচনের বাস্তবতা, পুঁজিবাদী মানসিকতায় মড়ক আনার বাস্তবতা, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী মনের গর্জে ওঠার বাস্তবতা। জাদুবাস্তবতা ভিন্ন এই সংকট থেকে উত্তরণের বিকল্প প্রতিষেধক আর কী'ই বা হতে পারে।

তিন

তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা হয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষি বনাম শিল্পের দ্বন্দ্ব পর্যন্ত পটভূমিকায় এক কৃষক পরিবারের চার পুরুষ ধরে চলা ভূমি দখল ও ভূমি অধিকার রক্ষার ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মে আধারিত সংগ্রামের কাহিনি **'মাঠ জাদু জানে'** (২০১০)।[৩৬] প্রকাশিত বইটির 'না-কথা' ভূমিকা অংশে লেখক বলেছিলেন :

> 'সামাজিক বাস্তবতায় দায়বদ্ধতাতেই আর এ কালের সাহিত্য আটকে নেই। বরং চলতি কাল, কালের মানুষ সময়ের নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীলতাকে মূর্ত করে তোলার জন্য বাস্তবতাকেই সৃজন করে নিচ্ছে। নিচ্ছে নিজের মর্জির অনুকূলে। কখনো প্রতিকূলেও। ফলে বাস্তবের, বাহ্য বাস্তবের এক স্তরিক পরতকে ছাড়িয়ে, এখন অনেক মাত্রা। যথা---অন্তর্বাস্তবতা, না-বাস্তবতা, জাদু-বাস্তবতা। শিল্প-সাহিত্যের কাজ দুইকে নিয়েই---বাস্তবতার ফসল সামাজিক মানুষকে নিয়ে ফের বাস্তবের সৃজনকর্তা অন্তর্বাস্তবের, না-বাস্তবের কিংবা জাদু-বাস্তবের মানুষকে নিয়ে।'[৩৭]

বস্তুত একবিংশ শতকে বাস্তবতার এই বহুমাত্রিক ডাইমেনশনে 'মাঠ জাদু জানে' -তে জাদুবাস্তবতার যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা আমাদের চমকে দেয়।

চল্লিশের তেভাগার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সন্তান জামির আলি। কংগ্রেসী জমানায় যোদ্ধার আর পুলিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দিতে যখন সে কৃষকদের উত্তাল করে তুলেছিল আন্দোলনের ঢেউয়ে; তখন শাসকের দাপটে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তার হাত-পা-শিরদাঁড়ার হারগুলো। অত্যাচারের দাপটে হয়ে গিয়েছিল বাকরুদ্ধ। স্থানু এই

মানুষটি এখন শুধু চোখ মেলে সব কিছু দেখে, এক'শ বছর বয়সের ভার নিয়ে। কিন্তু প্রতিবাদী সত্তাকে হারিয়ে ফেলেনি। পুত্র-নাতিদের যখনই কোনো অন্যায় সে দেখেছে, তখনই তীব্র আঘাতে মাটি বাজিয়ে প্রতিবাদ করেছে। পুত্র আমির আলি বর্গা করতে না চাইলে অনুভূতি সর্বস্ব এই মানুষটি মাটিতে বোল তুলে বুঝিয়ে দিয়েছিল পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার সর্বস্ব হারানো দিনটিকে সে কিছুতেই ভুলবে না। মাটিই বলে চলে তার সংগ্রামের কথা।

বস্তুত আখ্যানে জাদুবাস্তবতার সূচনা ঘটে জমির আলির হাত ধরেই। এই বোবা অথর্ব মানুষটি তার নিজের ছেলে আমির আলিকে হত্যা করেছিল, নাতি কওছারকে বর্গা করার সাহস না জোগানোর জন্য। এরপর আখ্যানভাগ এগিয়ে গিয়েছে কওছার ও তার স্ত্রী সাবেরার বুদ্ধিদীপ্ত সংগ্রামের হাত ধরে। যত ঘন হয়েছে আখ্যান, তত জটিল হয়েছে সিপিএম পার্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর যে প্রতিজ্ঞা থেকে তারা জমিকে শক্ত করেছিল, ক্রমে সেই কৃষকদের তোয়াক্কা না করে উচ্ছেদ করে শিল্প গড়ার মধ্য দিয়ে কবে কবে যে ধ্বংসবৃক্ষটিকে বপন করেছে, তা বুঝতে পারেনি কমরেডরা। একটি কৃষক পরিবারের চার প্রজন্ম ব্যাপী কামনা খাটা থেকে শুরু করে, কংগ্রেস বিরোধিতা করে বর্গা দেওয়া, জমির মালিক করার পরে কারখানার জন্য সেই জমি বিনা পরামর্শে ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে লাল-পার্টির দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ঘাত-প্রতিঘাতের, সমস্যা-সংকটের আখ্যানের এমন এক ভুবন লেখক নির্মাণ করেছেন---যা গড়পড়তা কৃষক জমি আন্দোলনের গল্প হলেও, হয়ে উঠেছে এক অনুভবী বাস্তবতার---জাদুবাস্তবতার আখ্যান।

মাটিতে বোল তুলে দাদু জামির আলি কওছারকে বলেছিল সংসার করতে। করেছে কিন্তু নিজের নামে জমি বর্গার না করায় বউ চলে গিয়েছিল বাপের বাড়ি। কাওছার ভীষণ সংকটে। তখন সদ্য ক্ষমতায় এসেছে বামফ্রন্ট সরকার। চতুর্দিকে চলছে অপারেশন বর্গা। ভাগচাষির নিজস্ব জমি। দোদুল্যমান মন নিয়ে কওছার সন্তর্পনে রওনা দেয় শ্বশুরবাড়িতে বউকে আনতে। মায়াবী রাত। আকাশে ফুটফুটে চাঁদ। সরাসরি চাঁদ কে প্রশ্ন রাখে কওছার :

'---এই হে চাঁদরানি তোর দেহডায় এত মায়া কনতে আলে রে ?

---আলোর থে ! ---চাঁদ পাল্টা উত্তর দিয়েছিল।

---আলোর থে ? তাই আবার হয় নাকিন ?

---ক্যানো হবে না ? কত্তোলোক আমারে মহব্বত করে। সেইসব মহব্বতের আলোয় আমার দেহডায় মায়া জন্মে।

---সত্যি ?

---সত্যি ! একশ'বার সত্যি।

---মানলুম। কিন্তু তাই যেদি হয় তেবে আমার সাবেরা তোর মতন মায়াবতী হ'লে না ক্যানো ?

---তোর মধ্যি মহব্বতের আলো নি তাই।

---মিথ্যে কথা। সাবেরারে আমি একশবার মহব্বত কোরি। হাজারবার মহব্বত কোরি।...

---না।

---তেবে ?

---ব'লবো ?

---হ্যাঁ।

---আমারে দেছে সুয্যি রাজা। তানার আলোয় আমি আলোবতী-মায়াবতী। সেইরাম তুই মদ্দ সুয্যি রাজা হ। সাবেরারে আলো দে। ভাগরার আলো। ভাগরা কর। তেজ দেখা। সেই তেজ আলো হয়ে সাবেরারে রানি ক'রবে---মায়াবতী ক'রবে।

---হেই চাঁদ তুইও তালি ভাগরার পক্ষি ?

কওছার বিস্মিত হয়ে চাঁদকে প্রশ্ন করেছিল। চাঁদ উত্তর দেয়নি। শুধু হেসেছিল।'[৩৮]

বস্তুত সংকটময় বাস্তবতায় যখনই কওছার হয়েছে দ্বন্দ্বময়, দ্বিধাগ্রস্ত তখনই তাকে লড়াই দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে লেখক নির্মাণ করলেন এক মায়াবী জগতের। সে জগত তাকে ইশারা দিয়ে ডাকে প্রতিবাদ করবার জন্য, ভাগরা করবার জন্য, জোর করে জমি নিজের নামে করবার জন্য। কেননা এটা কোন অন্যায় না।

বউ সাবেরার অত্যুৎসাহে আর মেম্বার প্রধানের সমর্থনে কওছার উঠে পড়ে লাগে জমি বর্গা করবার জন্য। কিন্তু পিতা আমির আলি কিছুতেই এর পক্ষে নয়। জমিদারকে সে মান্য করে। ফলে ছেলের বিপক্ষে সে জমিদারের লেঠেল বাহিনীকে নিয়ে আক্রমণ করবে প্ল্যান করে। তখন অনুভূতির মধ্যে বুঝে যায় শত বছরের বুড়ো

জামির আলি। কিন্তু সে তো কথা বলতে পারে না। নাতিকে জানাবে কেমন করে ? শুরু করল মাটি বাজানো। অমনি বাজতে বাজতে মাটি বলে : 'হেই সাত্তার, হেই বৌমা, বাল ব্যাটারে শেষ করে দে তোরা।'[৩৯] মাটির গা ছমছম করা সেই বাজনায় চমকে উঠেছিল কওছার। তারা টের পায় এখনি আসতে চলেছে একটি আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে তারা সতর্ক হয়ে যায়। আর জামির চলে যায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের সেই দিনে, যেদিন জামির আলি সর্বস্ব হারিয়েছিল এই জমি আন্দোলন করতে গিয়ে। চলে যায় আরো দূর অতীতে, যখন হেমন্তের নেতৃত্বে জামির সমস্ত মানুষকে এক করে লড়াই দিয়েছিল কংগ্রেস যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে। এই হল ম্যাজিক রিয়ালিজমের গ্রন্থন।

তেভাগার জন্য তিন প্রজন্মের মাথায় এসে কংগ্রেসীরা যখন গুটিয়ে গেল, তখন কাউসার জমি বর্গা করল। অতঃপর এক অভিনব সমস্যায় পড়ে কওছার। ফসল রক্ষার সমস্যা। লালপার্টি ঘনিষ্ঠ বড় বড় চাষিরা মাঠে আম গাছ লাগায়। ফলে আশেপাশের সব খেতে ছায়ায় ঢেকে যায়। সুব্যবস্থার আশায় কওছার ছুটে যায় মেম্বার প্রধানের কাছে। কিন্তু মেম্বার প্রধান আজ তাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে কওছার ছুটে ছুটে আসে সোজা মাঝেরদাঁড়ির দুই বিঘের বন্দে। দুই হাঁটু মুড়ে বসে জমির বুকে। বুক চাপা আর্তনাদে ফেটে পড়ে তার সমস্ত দেহমন। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন এক বিরাট আলো হয়ে চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় চাঁদ। তাকে জিজ্ঞেস করে :

---কী হল কেন্‌তিছিস ক্যানো ?

---কাঁদবো না ? পোধান-ভাই আমারে এতোডাই ভুল বোঝলে ?

---বোঝলে-বোঝলে তাতি কী ?

---কাল সক্কালে সব্বাই জানলি কী ভাববে আমারে ?

---যা ভাবার ভাববে। তোর অ্যাখোন অনেক কাজ। যা কাজে যা।

---কেঙ্করে যাই ? কনে যাই আমি ? মাঝেরদাঁড়ির সমুস্যেডার তো কোনো সমাধান হ'লে নাকো।

---হবে।

---কেঙ্করে ? ওপরতালার নেতা তো আমল দেলে না।

---ওটা ওপরতালা না। মাঝের তালা। সেই জন্যিতি বেপদ বাধলে।

---মাঝের তালা ? পোধান-ভাই তো সাংবেড়ে গ্রামের ওপরতালা। নাকি ?

---না। ওপরতালার কিংবা নীচের তালায় কোনো গণ্ডোগোল বাধে না। য্যাতো গণ্ডোগোল এই মাঝের তালায়। বুয়েছো ?

---না ! বুঝলুম না। মেম্বার পোধান এযদি ওপর তালা না হবে তেবে ওপর তালা কেডা ?

---ওপরতালা বড়ো মেম্বার। তার ফেরে তারো বড়ো মেম্বার। তার ফেরে তারো বড়ো কেউ। এইরাম করে এই আমি চাঁদ পোন্তক উঠরি হবে। বুইলি ?

---হুঁ। আর নীচের তালাডা কী ? সেখানে কারা আছে ?

---সেটা তালাডায় তো তুই রইছিস। তোর কৃষক সভা রয়েছে।

---তাহলে আমি কি ক'রবো ? কনে যাবো ?

---যাবি ওপরতালার কাছে।'[৪০]

কওছার বড় মেম্বারের কাছে যায়। কৃষক পার্টির সেক্রেটারি হয়ে একটি বিরাট মিটিং ডাকে সে। মিটিং-এ বড় মেম্বার গর্জে উঠে জানায় ১৯৪৯ সালে আন্দোলনের জেরেই 'ভাগচাষি আইন' পাস করাতে বাধ্য হয় কংগ্রেস সরকার। অথচ আজকে বড় জমির মালিকদের আশ্রয় দিয়ে সেই পার্টি চাষিদের মেরে ফেলতে চাইছে। বস্তুর এই বক্তব্যের পর বড় মেম্বার ওপরতলা থেকে একঘরে হয়ে যায়। আখ্যান যত এগুতে থাকে জমির জট তত ঘোরালো হয়ে ওঠে। কওছারের পটল ক্ষেতে আর পটল ফলে না। বাকরুদ্ধ হয়ে যায় কওছারের জমি বর্গার শরীক স্ত্রী সাবেরার। সে বিকারগ্রস্ত হয়ে একদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখে, যা পাঠকবর্গকেও চমকে দেবে। স্বপ্নটির বর্ণনা লেখক দিচ্ছেন :

'ঘুমের মধ্যে সাবেরা দেখে---তার বড়ো সাধের মাঠ, মাঝেরদাঁড়ির বুকটা, আচাট হয়ে যায়। ধান বা পটল খেতের সুফলা অবস্থান ছেড়ে ভরে ওঠে আম গাছে, ইয়াব্বড়ো-বড়ো আমগাছে। সাবেরা মানতে পারে না। বড়ো ভরসার মাঠ তার। অনেক লড়াইয়ের পর এ মাঠের দখল পেয়েছিল তারা। তাই সই-নিঃশ্বাসে দৌড়ে যায় মাঠে। যাওয়ামাত্রই ঘটে বিপত্তি। গাছগুলো গাছ থাকে না তখন। লহমার

> মধ্যে তার বন্দে তো বটেই, সারাটা মাঝেরদাঁড়ির মাঠে সার সার দাঁড়িয়ে যায় বিরাট বিরাট সব অট্টালিকা। তাদের মাঝে জম্পেশ করে গড়ে ওঠে চিমনি ওঠা নানা ঢঙয়ের কল-কারখানা। এসব দেখে প্রতিবাদে গর্জে উঠে সাবেরা---'না, আমি হোতি দোবো না। সপ ভেঙে-চুরে লন্ডভন্ড করে দোবো।' গর্জনে-গর্জনে সারা মাঠ মাতিয়ে দেবার পর সে যেমনি একটা আধটা কারখানার গায়ে ভাঙনের আঙুল ছোঁয়ায় অমনি সে-কলের, সে-কারখানার চিমনিটা লাঙল হয়ে যায়। লাঙল বলে লাঙল ইয়াব্বড়ো লাঙল হয়ে যায়। সেই লাঙলকে যেমনি ভূমিতে নামাতে যায় অমনি সেটা, জাদু বলেই যেন, কোন এক আজদেহ পুরুষাঙ্গ হয়ে যায়। মহা পুরুষাঙ্গ।...তারা চক্রব্যূহ রচনা করে। সাবেরাকে ঘিরে ধরে।...ভয়ে আতঙ্কে সাবেরা চিৎকার করতে থাকে---'বাঁচাও বাঁচাও।'[৪১]

জমিকেন্দ্রিক অনাগতকালের পুঁজিবাদী গ্রামের নির্মম বাস্তবতা লেখক দুঃস্বপ্নের মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে দিয়েছেন যে, আখ্যানের অন্তিমে আমরা দেখব, এই দুঃস্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে আসলে কোন ফারাক নেই। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গণৎকারের হাত গণনা করে ভবিষ্যৎ কথন নয়; এ হল অবধারিত নিয়তিকে মোকাবিলা করবার জন্য আগাম মানসিক প্রস্তুতি। 'বাঁচাও বাঁচাও' তারই আগাম বাকরুদ্ধকর পরিস্থিতি।

এই স্বপ্নের পর শুধু মাঝেরহাট নয়, আশেপাশের সমস্ত তল্লাটের জমির উপর একটা কালো মেঘ দেখতে পেয়েছিল কওছার। যে বাম পার্টির সৌজন্যে ক্ষুদ্র চাষিরা জমির মালিকানা হাতে পেয়ে ছিল; তাদেরই উপর তলার নেতার দাপটে এবার তারা শুধু জমি ছাড়াই হবে না, হবে বাস্তুহারা। দীর্ঘ রাজত্বে দলের মধ্যে অহংবোধ বাড়ছিল, যে ঔদ্ধত্বে চাষির স্বার্থে তারা আঘাত হেনেছিল, তার তীব্র সমালোচনা করেছেন লেখক। অতঃপর দেখা যাবে পুরো এলাকাটি শিল্পের জন্য গৃহীত হয়েছে। দিনবদলের সাথে সাথে দলের কৌশলও বদল হয়েছে। তখন তাদের চিন্তায় শ্রমিক নয়, শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান। জমিতে গাড়ির কারখানা হবে, ওষুধের কারখানা হবে, মানুষ হবে উচ্ছেদ। সরকারি এই নোটিশ জারি হওয়ার পর, কওছার ফের ছুটে যায় তার দু'বিঘের বন্দে। সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে মাটিকে জিজ্ঞেস করে :

'---মাটি, মাটিরে ! চ্যাতনা আছিস ?

---আছি ! ---মাঠ জবাব দেয়---আমার শরিলি তো ঘুম বোলতি জিনিস নিকো !

---তাই ?

---হ্যাঁ তো ! আমি ঘুমুলে তো সৃষ্টি অচল হয়ে যাবে !

---আর ?

---আমার সন্তান চাষাবাসা মানুষ বিপদে প'ড়বে !

---তোর সন্তানদের বিপদের কথা ভাবিস তুই ?

---ভাবি। রাত্তির-দিন সপ সোমায় ভাবি !

---তাই যেদি হয় তো সত্যি করে বলদিনি এ মাঠের বুকি কি ভয়ংকর অ্যাটটা বিপদ লেবে এসতেছে ?

---হ্যাঁ এসতেছে।

---তাহলে কি আমরা মাটি হারা হবো !

---হওয়া-না-হওয়া সবই তো তোরগা হাতে।

---মানে ?

---মানেডা সোজা। তোরা যেদি মাটি কেমড়ে পোড়ে থাকিস তেবে মাটি তোর বস থাকপে। ফের... !

---ফের কী ?

---ফের যেদি মাটির সম্ভ্রম রক্ষিত না করিস তেবে সব হারাবি।

---তালি তো বেশ বড়োসড়ো অ্যাটটা লড়াই ফের দিতি হবে; কি বলিস ?

---তা দিতি হবে !

---সে লড়াই কি একলা দোবা যায় নাকিন ?

---যায় না। ম্যালাই লোক মিলে দিতি হয়। হাজার জন-মনিষ্যিরিরে একত্তর কোরতি হয়।

---তা জন-মনিষ্যি সপ জাগলে কই ?

---ওই তো। চেয়ে দেখ ! '[৪২]

মাটি-মানুষের এই কথপকথনের ভাষ্যটি ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম। মুক মাটি মুখর হয়ে কথা বলছে। আন্দোলনের পথ বাতলে দিচ্ছে। একুশ শতকের মাটি কেবল আর সহনশীল বস্তু নয়; প্রাণবন্দ বাস্তবতায় একটা সরকারের বদল ঘটিয়ে দিতে পারে ! লেখক সেই ক্ষমতার বাস্তবতাকেই ফুটিয়ে তুললেন এই বয়ানে। বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকেও এ বয়ান আমরা পাই না।

ততক্ষণে সকাল হয়ে গিয়েছে। মাটির নির্দেশে চোখ খুলেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় কওছার। এবার শুধু মাঝেরদাঁড়ি মাঠেই নয়; দক্ষিন মাঠ, পান্তামারির মাঠ, সব মাঠের চাষিরা জটলা করে ঘিরে ধরে তাদের কৃষক-নেতা কওছারকে। বস্তুত বর্গা করার সময় লাল-পার্টি তাদের পাশে ছিল। কিন্তু এখন সেই লাল-পার্টি তাদের শত্রু। এমতাবস্থায় তারা কী করে জমি রক্ষা করবে ? কার সমর্থন পাবে ? কিংকর্তব্যবিমূঢ় কাউছার কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে ফের দ্বারস্থ হয় মাঠের কাছে। আর মাঠ কিনা বলে, 'ফের লড়াই দিতি হবে ! ' গরিবের পাশে যখন কেউ নেই, বাস্তবের সমস্যার মুখোমুখি হতে তখন গরিব ভীষণ ভয় পায়। লেখক সুকৌশলে সেই ভয়কে উপড়ে ফেলে রচনা করলেন এক বিকল্প বাস্তব; যেখান থেকে মনের শক্তি পায় চাষিরা। আরো আশ্চর্য লাগে যে কওছারের ভাই সাত্তার এক কালে যে বর্গার জন্যে লড়াই দিয়েছিল, ছেলের চাকরির জন্য সে আজ চাষি বিরোধী !

ফের একবার নতুন উদ্যোমে সংঘবদ্ধ হতে থাকে চাষিরা। আজকে তাদের লড়াই একটা গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই। পুঁজিপতি পার্টির বিপক্ষে লড়াই। কেবল আখ্যানের শেষে নয়; আমরা দেখব যে বাস্তবের রাজনীতিতে এই কওছারদের কাছে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। চোখ রাঙানি দিয়ে তো মানুষের মনকে আর দুমড়ে দেওয়া যায় না। এবারের লড়াইটা যে ভীষণ কঠিন লড়াই হতে যাচ্ছে কওছার তা বোঝে। কিন্তু আন্দাজ করতে পারে না সবটা। তাহলে তার রণকৌশল কেমন হবে ? ফের ধন্দে পড়ে কওছার। জামির আলি অদৃশ্য থেকে তার নিদান দিয়ে যায় :

> 'এবার লড়াইডা, বুইলি নাতবউ---বড্ড কঠিন। বড্ড জটিল। পক্ষি-বে-পক্ষির হিসেবডা মিনিটে-মিনিটে পেল্টে যাবে। সাবধান ! ... ভাবিসনে, ঠাকুর বটতলার জিন হয়ে আমি কচোরের পাশে থাকপো ! বুইলে'[৪৩]

স্বপ্নের বাস্তবতায় কওছার বুঝে যায়, বাস্তবে কেমন করে লড়াই দিতে হবে। বর্গা-দিনের সরকারের বিরুদ্ধে আজকে তাদের লড়াই। এ লড়াই মাটিকে বাঁচানোর লড়াই। উদ্বাস্তুকে হটানোর লড়াই। পুঁজিপতিকে তাড়ানোর লড়াই। তারা কৃষিজমি ও জীবন রক্ষা কমিটির মুখোশ পরা মাওবাদীদের হাত ধরেছে ঠিকই কিন্তু এই লড়াই শেষ পর্যন্ত তারা জিতেছে। সরকারপক্ষ মানুষের রায়ের কাছে নতি স্বীকার করেছে।

শেষ পর্যন্ত জমি বেঁচেছে, মাঠ বেঁচেছে, মাঠের জাদু বেঁচেছে। বস্তুত একটি কৃষক পরিবারের চার-প্রজন্ম ব্যাপী উত্থান-পতনের সঙ্গে মাঠের, মাটির, চাঁদের, জিন-পরির অসাধারণ আত্মিক যোগের ভাষ্য লেখক নির্মাণ করেছেন। প্রতিপদে ব্যর্থ হলেই এই অবস্তুক উপাদানগুলোর কাছ থেকে কওছার যে জীবন-সঞ্জীবনী-সুধা নেওয়ার, মনের কথা বলার ও উৎসাহ নিয়ে লড়বার, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করবার যে অলৌকিক ভাষ্য সৃষ্টি করেছেন; তা সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসের বাস্তবতার এক মায়াবী নির্মাণ। আখ্যানের এই বিকল্প বুননে একজন সাধারণ মানুষকে যে ভয়ংকর প্রতিরোধী করে গড়ে তোলা যায়---মাঠের জাদু দেখানোর প্রত্যেকটি পলকে তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে।

চ তু র্থ প রি চ্ছে দ

দেবর্ষি সারগী : বিকল্প গ্রন্থনায় স্থিতধী ভবিষ্যতের নির্মাণ

এক

একুশ শতকের আখ্যানকার দেবর্ষি সারগী (১৯৫৫) মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নগুলোকে রূপকথার মোড়কে এমন এক কল্পকথার লোকালয়ে প্রয়োগ করেন যে, পাঠক হিসেবে আমরা ডুবতে থাকি এক স্বপ্নের ঘোরে। ভাবতে থাকি এমন দেশ কি আদৌ কোথাও আছে ! আর একটু গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে ভাবলে আমরা চমকে দেখি, এ তো এ যুগের প্রত্যেকটি সভ্যতার মানুষের মধ্যে চমৎকার খেটে যায়। মার্কেসের 'মাকোন্দো'র মতো বা মহাশ্বেতার 'পিরথা'র মতো তখন নগরটি হয়ে ওঠে ঘন বাস্তবময়। তেমনই একটি শহর নিয়ে রচিত 'সওদাগরে'র (২০০৪) আখ্যানও ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের আধারে বাস্তব সমস্যা ও তার থেকে সমাধানের কাহন।

এখানে যে শহরটির কথা বলা হয়েছে, সেখানকার মানুষগুলো হতদরিদ্র শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের হলেও বেশ সুখী তৃপ্ত ও বিশ্রাম নিমগ্ন। অর্থের পিছনে লালায়িত নয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থটুকু সংগ্রহ হলেই তারা কর্মজগৎ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিমগ্ন করে দেয় বিশ্রাম, আড্ডা, সৌন্দর্যচর্চা, রূপকথার জগতে। মানুষগুলো কর্মহীন সন্ধ্যায় উদ্দেশ্যহীন জীবনটাকে খুব ভালোবাসে। তারা বই পড়ে, কেননা বই পড়ার নৈঃশব্দ্য তাদের ভালো লাগে। রাত্রিবেলা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কেননা রাত্রির নরম আলো তাদের ভালো লাগে। এমন একটি জনপদে হঠাৎ করে যদি কোন সওসাগর আবির্ভূত হন ব্যবসা ফাঁদবার জন্য তাহলে লোকালয়টি কেমন হবে ? একের পর এক সম্মোহনী আখ্যানের সুতো দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন লেখক।

ফাগুনের এক রাতে দশ জন দক্ষ মানুষ নিয়ে হঠাৎ শহরটিতে হাজির হয় এক বিত্তমান সওদাগর। তার ইচ্ছে শহরটার অর্ধেকটা কিনে নিজের মতো করে গড়বে। শহরটার ফাঁকা জমি, অপ্রয়োজনীয় গাছপালা, অর্থহীন বাড়িঘর, আড্ডার জন্য নষ্ট জায়গা আর অসহ্য লাইব্রেরি---এ সবই সে বদলে দিতে চায়। দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝেও আশ্চর্য নীরবতায় মনে হবে শহরটি ঘুমিয়ে আছে। লাইব্রেরিয়ান অনঙ্গকে নিয়ে শহর দর্শনের সময় টের পায় মানুষগুলোর আড্ডাপ্রিয়তা ও নীরবতা। ফিরে এসে সে সরকারকে চিঠি লেখে এই বলে যে, এই শহরটার সমস্ত ফাঁকা জমি, জমির নীচের পাতাল, বাড়িগুলোর ছাদ, বাগান, সমস্ত গলি রাস্তা, নদীর চর, পাহাড়, শহরের আকাশ---সব কিনে নিতে চায়। এই হল ব্যবসায়ী মানসিকতা। অর্থের দম্ভে মানুষের সবকিছু কেড়ে নিতে চায়। কোলাহলহীন, শান্তিপ্রিয় এমন একটা শহর বিশ্বায়নের উদগ্র লালসায় কিভাবে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে একটি মানুষের হাত ধরে, তার ছবি উঠে আসে। ব্যবসায়ীর মতে তাদের এই বাঁচাটা আসলে কোন বাঁচাই নয়। সে বদলে দিতে চায় সবকিছু। পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগেও পড়ে। কেউ তার কাজে বাধাও দেয় না। তাহলে অর্থের কাছে সবকিছুই কি অপ্রতিরোধ্য ? বোধ হয় না। বিশ শতকীয় আখ্যানগুলোতে শাসকের বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের বয়ান আমরা পাই, একুশ শতকে দেবর্ষি সারগীর হাত ধরে প্রতিবাদের ধরনটাই সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে। একজন বিত্তমান বেপরোয়া ব্যবসায়ীর সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে শান্ত

ধৈর্যশীল হয়েও সামান্য খেটে খাওয়া মানুষের নিঃশব্দ প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়, তার তিনটি উদাহরণ আমরা তুলে ধরব :

(এক) কাজ শুরুর জন্য ব্যবসায়ী অনঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে কেরু মিস্ত্রীর কাছে। কেরু তখন এক বিশাল মাকড়সার জালের দিকে তাকিয়ে। সওদাগর জিজ্ঞেস করে :

> 'ওই জালটা দেখছ ?'
>
> 'হ্যাঁ।'
>
> 'বৃত্তটাকে ঠিক দেড় ইঞ্চি অন্তর অন্তর লম্বা টানা দিয়ে বাঁধা হয়েছে।'
>
> 'হ্যাঁ।'
>
> 'আমি ভাবছি---মাকড়সার কাছে তো কোনও স্কেল থাকে না। তবু টানাগুলোকে ঠিক দেড় ইঞ্চি অন্তর অন্তর সে কি করে বুনল বলো তো ? বসে বসে আমি এটাই ভাবছি।'
>
> 'তুমি কাল সকালে আমার হোটেলে এসো। আমাদের নক্‌শাটা তোমাকে দেখাব। তাতেই বুঝবে এখানে কী করতে চাইছি।'
>
> 'হয়ত নিজের পদক্ষেপ গুনে গুনে সে মাপটা ঠিক করে।'
>
> 'কাল কখন আসছ ?' এবার একটু বিরক্ত হয়ে সওদাগর জিজ্ঞেস করেন।
>
> 'আমি এখন দু'-চার মাস কোনও কাজই করব না,' মিস্ত্রিটা বলে।
>
> 'কেন ?' অবাক হয়ে জানতে চান সওদাগর।
>
> 'এই তো টানা প্রচুর কাজ করলাম। এখন আর কাজের দরকার নেই। ভালো লাগছে না।'[৪৪]

(দুই) এরপর সওদাগর মালের জন্য এক হার্ডওয়ার দোকানের কাছে যায় দোকানদারের কাছে জানতে চায় :

> 'মাল সরবরাহ করার ক্ষমতা তার কেমন, কারণ তাঁর অনেক মাল লাগবে। লাজুক হেসে দোকানদার জানাল একসঙ্গে খুব বেশি মাল দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই, তবে সময় দিলে সে আস্তে আস্তে দিতে পারবে। তাছাড়া, সে মন্তব্য করল, শহরে তো আরো অনেক দোকান আছে, প্রয়োজনমতো সব জায়গা থেকে নিলে অসুবিধে হওয়ার কথা

নয়। সওদাগর অবাক হলেন। মাল বিক্রির সুযোগ অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বেচ্ছায় দিয়ে দিচ্ছে এমন ব্যবসায়ী তিনি এর আগে দেখেননি।'[৪৫]

(তিন) এবার তারা গেল মিস্ত্রি পাড়ায়। সবাই তারা তখন ছাদে। সওদাগর উপরে উঠতেই তাদের একজনের ইঙ্গিতে মাটিতে বসল। তখন তারা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির ব্যাখ্যায় মশগুল :

'এর বেশি আর কিছু মনে পড়ছে না,' একজন খুব শান্ত গলায়---যেন জলে ডোবা মানুষের কণ্ঠস্বর---অন্যদের বলল।

'স্বপ্নে তাহলে তুমি এটুকু দেখেছ যে বিধাতা একদিন শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছেন, চোখ বোজা আর ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, আর কুচকুচে কালো মিষ্ট আকাশে কোথা থেকে একটা বিন্দু ভাসতে ভাসতে সূর্য হয়ে গেল। তারপর আকাশে ফুতে উঠতে লাগল অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র। এর বেশি কিছু দেখোনি ?'

'না।'

'তাহলে মানুষ কীভাবে এল ?'

'সেটাও চিন্তা থেকে,' অন্য একটা লোক বলল। 'চন্দ্রসূর্য যদি চিন্তা থেকে তৈরি হতে পারে, তবে মানুষের মতো একটা ক্ষুদ্র জীব কি পারে না ?'

'আমি ভাবছি অন্য কথা,' আর একজন বলল। চন্দ্রসূর্য না হয় জড়বস্তু। কিন্তু মানুষ তো চিন্তা করতে পারে। চিন্তার সাহায্যে বিধাতা যখন মানুষ গড়ছেন তখন মানুষ কি বুঝতে পারে নি তাকে গড়া হচ্ছে ?'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে বিধাতা তাকে গড়ছেন,' একজন বলল।...

এবার এই আট-দশ জন লোক বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। চোখেমুখে তখনো ভাবনা, অনুভব ও বিস্ময়ের সুখকর উত্তেজনা।...সওদাগর বিরক্ত হয়ে ইঙ্গিতে অনঙ্গকে একবার বলেছিলেন এখান থেকে আপাতত চলে যেতে, পরে আবার আসা যাবে।

> 'ইনি আমাদের শহরটাকে নতুন করে গড়বেন বলে এখানে এসেছেন,' কাছে এগিয়ে এসে অনঙ্গ ওদের বলল। সওদাগরও কাছে এগিয়ে গেলেন। 'অনেক নতুন নতুন ও বড় বড় বাড়ি তুলবেন। জমি খুঁড়বেন। পাহাড় কাটবেন। তাই আপনারা যদি এই কাজগুলো করে দিতে রাজি হন, তাহলে ভালো হয়।'
>
> 'এত কাজ শেষ করতে তো কয়েকশো বছর লেগে যাবে,' একজন অবাক হয়ে বলল। 'ততদিন তো আমরা বাঁচবই না। ইনি নিজেও তো ততদিন বাঁচবেন না নিশ্চয়ই।'
>
> 'বাঁচামরার কথা কেউ কি আগে থেকেই বলতে পারে ?' ক্রোধ সম্বরণ করতে করতে সওদাগর বললেন।
>
> 'তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, অত কাজ অত দুশ্চিন্তা আমাদের আর ভালো লাগে না। এখন একটু শুয়েবসে থাকতে ইচ্ছে করে। গল্প করতে ইচ্ছে করে।'
>
> সওদাগরের মাথা ঝিমঝিম করছিল তিনি আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি ছিলেন না।'[৪৬]

অবর্ণনীয় বর্ণনা। যেন বিকেলের মৃদুমন্দ বাতাসে সাগরের ছোট ছোট ঢেউ। কত শান্ত, কত নিরুত্তাপ। অর্থ রোজকারই যে জীবনের একমাত্র ধর্ম নয়; নিজেদের একটু মানসিক আরামেরও প্রয়োজন আছে---কত ধীর, স্থির, শান্তভাবে তারা সওদাগরকে বুঝিয়ে দিল। শাসক শ্রেণিকে প্রত্যাখ্যানের এমন ভঙ্গিমা আমাদের কথনবিশ্বে বিরল। সাধারণ সব মিস্ত্রি হয়েও কেউ পতঙ্গের শিল্পকলার দার্শনিক ভাবনায় ভাবিত; কেউ চন্দ্র সূর্যের উৎপত্তি নিয়ে, কেউবা মানুষ সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নিয়ে ভাবিত। শাসককে প্রত্যাখ্যান করে শ্রমজীবী মানুষের এই যে ভাবনার দ্বারকে খুলে দেওয়া---এটাই সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জোগাবে সুস্থভাবে বাঁচার পথ। এটাই জাদুবাস্তবতার অসম্ভব সুন্দর দৃষ্টান্ত।

সওদাগর তবুও হাল ছাড়ে না। কিছু লোক নিয়েই শুরু করে পাহাড় কাটার কাজ। বিরাট উৎসাহে প্রথম দু'দিন তারা কাজ করল। তৃতীয় দিন যখন তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলো কেউ আর নীচে নামতে চায় না। একলপ্তে পুরো শহরের সৌন্দর্যটা তারা জীবনে দেখেনি। নদী, গাছ, রাস্তা, মানুষ দেখতে দেখতে তারা মোহিত

হয়ে যাচ্ছিল। যেন হাতের চেটোয় তুলে নেওয়া যাবে সব। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ছাড়িয়ে কখন যে রাত নেমে এল তারা বুঝতেই পারেনি। এরপর যখন চাঁদ উঠল এক গভীর স্তব্ধতায় সকলেই মুহ্যমান হয়ে গেল। জীবনের অপসৃয়মান স্বপ্নগুলো ডানা মেলতে শুরু করল। এমন আবিষ্ট লাগছিল যে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। একটি মিস্ত্রি ভাবতে ভাবতে ঘুরে বেড়াতে লাগল এমন শহর ও গ্রামে যেগুলো বাস্তবে কখনো সে দেখেনি। 'তবু তার মনের পর্দায় ভাসছিল অনেক গ্রাম ও শহরের ছবি, অনেক প্রাচীন, ধ্বংস হয়ে যাওয়া জনপদ এর ছবি।'[৪৭] আসলে অর্থ ও স্বার্থের জন্য পিঁপড়ের মতো ছোটাছুটি তাদের একদমই পছন্দ নয়। পাহাড়ের উপরে চড়ে কত কল্পনা, কত চিন্তা, কত অনুভব করে গেল সারারাত একটুও না ঘুমিয়ে। একটি সারা রাতের রোম্যান্টিক অভিজ্ঞতা তাদের আগামী কয়েক বছর বাঁচার খোরাক হয়ে গেল। কর্মজগৎ থেকে তারা সন্তর্পনে নিজেদের সরিয়ে নিল।

সওদাগর তবুও হাল ছাড়ল না। জাহাজে করে বাইরে থেকে লোক আনতে শুরু করল। প্রথমেই সে তাদের দিয়ে শহরের আড্ডা মারার স্থানগুলোতে ভাঙতে লাগল। আর বড় বড় গাছগুলো কাটতে লাগল। ঠিক এই সময়ে অবশিষ্ট এলাকাটিকে অক্ষত রাখার জন্য লেখক এবার রচনা করলেন একটি দুঃস্বপ্নের বয়ান; যা সওদাগর দেখবে মাঝরাতের স্বপ্নে :

> 'নিজের শহরের বৃষ্টিভেজা, কাদামাখা চেনা গলি দিয়ে তিনি যখন বাড়ি ফিরছেন, হঠাৎ একটা বাইসনের মত প্রকাণ্ড মোষ তাঁকে পেছন থেকে তারা করতে লাগল। তিনি দৌড়তে লাগলেন। দৌড়তে দৌড়তে নিজের বাড়িও পার হয়ে গেলেন, কারণ দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করলে মোষটা তাঁকে গুঁতো মারত। দৌড়ে অন্য গলিতে ঢুকে যখন ভাবছেন মোষটা নিশ্চয়ই আর তাঁকে খুঁজে পাবে না, তিনি হতভম্ব হয়ে লক্ষ করলেন সামনের একটা বাঁক থেকে তাঁর দিকে ছুটে আসছে অন্য একটা মোষ। দ্বিতীয় মোষটা তাকে গুঁতোবার আগেই তার ঘুম ভেঙে যায়।'[৪৮]

এই স্বপ্নে যতটা আতঙ্কিত ছিল সওদাগর, জাগরণে তার আতঙ্ক বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। শহরের উদ্ভট লোকগুলোকে সে আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। অগত্যা শহর গড়ার সব কাজ বন্ধ রেখে লেবারদের মাটি খুঁড়তে লাগাল; মাটির নীচে

আত্মরক্ষার্থে একটি বাঙ্কার তৈরির জন্য। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ভার নিতে না পেরে মাঝপথে একে একে কর্মী পালাতে শুরু করল। কিছুজন তো এলাকার মানুষগুলোর ভাবধারার সঙ্গে মিশে গেল। অবাক চোখে স্বপ্ন ভাঙার তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে সওদাগর আরও অস্থির হয়ে ওঠে। এত স্বপ্ন, এত শ্রম, এত অর্থের অপচয় তাকে উন্মাদ করে দিল।

জাদুবাস্তবতার আখ্যানে একারণেই আসে স্বপ্নের অনুষঙ্গ। একটা দুঃস্বপ্ন দিয়েই লেখক বিশ্বায়নের বিষমাখা তীরটাকে ভেঙে খানখান করে দিলেন। ধ্বংস করলেন সওদাগরের অর্থ নেশার স্বপ্নকে। আর আহং-এর তরী বেয়ে আসা সওদাগরকে। রক্ষা পেল সুস্থ সুন্দর নগরটি।

দুই

এমনই আর একটি নগর ম্যাজিক রিয়ালিজমের মোড়কে আর একটি অন্য ডাইমেনশন নিয়ে উপস্থিত হবে দেবর্ষি সারগীর 'রূপান্তর' (২০০৮)-এ। 'রূপান্তর' এর আদর্শ বাংলা হতে পারে পরিবর্তন। মানুষ মরণশীল কেবল নয়, পরিবর্তনশীলও। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের লেখচিত্রে আত্মার যে বিবর্তন দৃশ্যগ্রাহ্য হয়, তা কি আদৌ ঊর্ধ্বগামী ? গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে বেরিয়ে লেখক এই প্রশ্নটিকে উসকে দিয়েছেন যে, আধুনিক মানুষের গন্তব্য শেষ পর্যন্ত কোথায় ? উন্নত হওয়ার দিকে, নাকি বিবর্তনের উল্টো দিকে হেঁটে আবার পশুত্বে ফিরে যাওয়ার দিকে ? আশ্চর্য এক কাহিনি ও চরিত্র ভাবনার ভেতর দিয়ে লেখক অনন্ত অতীতের পশ্চাদ্‌গামীতায় মনুষ্য মনের স্থিরতার একটি সুন্দর জাদুবাস্তবতার গ্রাফ এঁকেছেন তার 'রূপান্তর' উপন্যাসের আঙিণায়।

আখ্যানে এমন একটি লোকালয়কে লেখক বেছেছেন, যেখানকার মানুষেরা দিনরাত আতঙ্কগ্রস্ত থাকে মৃত্যুকে নিয়ে। সেখানে তারা মনে করে মানুষের ভেতর মৃত্যুচেতনার উপস্থিতিই মানুষের সুখ, শান্তি ও নিশ্চিন্ততার বোধ কেড়ে নিয়েছে। একটা মানুষ সব সময় এই জ্ঞান যদি বহন করে যে, সে যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে; অথচ পশুদের মধ্যে এই জ্ঞান নেই বলে তারা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সুখী ও নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করে তখন মৃত্যুকে ভুলতে তারা পশু হওয়ার সাধনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এভাবেই তারা চেষ্টা করে কখনো বাঘের মতো হতে,

কখনো কুমির বা সাপ বা কুকুর, পাখি ও ব্যাঙের মতো হতে। কিন্তু তা তো সম্ভবপর নয়। তাই শেষ পর্যন্ত তারা লিপ্ত হয় পরস্পরকে হত্যা ও ধ্বংস করার হিংস্র যজ্ঞে। একুশ শতকের বিজ্ঞানের অগ্রগতি দিয়ে মানুষ পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাবিশ্বকে জয় করে সুখের যাবতীয় উপকরণ জোগাড় করলেও; মৃত্যুকে এখনো অমরত্ব দিতে পারেনি। তারিই বৃথা চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বিজ্ঞানের সন্তানেরা যে লোলুপতায় নিমগ্ন হয়, তা যেমন লজ্জাজনক, ধিক্কারময় তেমনি আত্মহননকারীও বটে। বাস্তবতার এই সমস্যাটিকেই লেখক অত্যন্ত সুচারুভাবে গ্রহণ করে জাদুবাস্তবতার মায়াবী আখ্যান নির্মাণ করেছেন।

এই উপন্যাসে লেখক একটি বিশেষ লোকালয়ের সমস্ত মানুষের ভাবনা ও স্বপ্নগুলোর প্রত্যক্ষ সাক্ষী রেখেছেন গল্প কথককে। কথক অদৃশ্য ভাবেই তাদের শুধু জীবন নয়, মস্তিষ্কের আবছায়া গোলকধাঁধার মধ্যেও ঢুকে পড়ে। উপন্যাসের শুরুতে হিমা নামে যে যুবকটি একটি যুবতীকে নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে, তার বিলাসবহুল জীবন আমাদের চমকে দেয়। তার দাঁত সোনায় বাঁধানো। দরজা, জানালা, দেওয়ালের কাজ, কলম সবই সোনার তৈরি। বাড়ির বাসনপত্র, পাখা, ঘড়ি, অ্যাশট্রে, চিরুনি, বালতি, চামচ, দাড়ি কামানোর ব্লেড, বার্থরুমের ব্রাশ সবই সোনার। প্রাচুর্যের কোন অভাব তাদের নাই। অথচ দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ! নিজস্ব লাইব্রেরিতে বছরের পর বছর গভীর মনোযোগ দিয়ে সে একটা বাক্যই লিখছে : 'ঠিকমত পশু হতে পারলেই মানুষ সুখী হয়ে উঠবে।'[৪৯] অর্থাৎ এই মুহূর্তে মৃত্যু নিয়ে তার মস্তিষ্ক জুড়ে চলছে এক উদ্দামতা।

যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে এই ভাবনা নিয়ে যখন কোনো মানুষ বাঁচে, তখন বেঁচে থাকাটা তার পক্ষে দুর্বিষহ। এই ভাবনাতেই মুহ্যমান থেকে হিমার বাবা আজ নির্বাক বৃদ্ধ। এই চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার একটাই উপায় বের করেছে তারা নারী সম্ভোগ - গভীর নিদ্রা নয়। একই চিন্তা মাথায় নিয়ে অদ্ভুত ভাবে তার মাও বাড়িতেই জমায় পুরুষ সম্ভোগের আসর। স্বজ্ঞানে বাঁচার দিনগুলোতে তারা চারপেয়ে জীবের মত হাঁটার চেষ্টা করে। অবোধ পশু হবার জন্যই। পশু হতে পারাটা তাদের কাছে স্বপ্ন। মনহীন একটা পশু। হিমার বোন পশু হওয়ার সাধনায় কোন জামা কাপড়ই পড়ে না। এমনকি স্নান করাও বন্ধ করে দিয়েছে। এদের প্রত্যেকেই মনুষ্য জনিত মন নিয়ে মৃত্যুর ভয় থেকে বাঁচতে আরো বেশি করে অশান্ত যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ছে। পশুত্বের সাধনায় তাদের চলাফেরা, জীবনযাপন, আচার-আচরণ সবই হয়ে

গিয়েছিল চারপেয়ে শ্বাপদ পশুর মত। তাই খাবার সময় কেউ কারো দিকে তাকায় না। খাবার পর গল্পগুজবকে ভীষণ রকম অনাবশ্যক মনে করে।

অদৃশ্য কথকের দৃষ্টিতে রাতের এই নগরীতে আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, রাতগুলোতেও রাস্তায় দিনের মত চলাফেরা করছে লোকজন। সব পুরুষের কাঁধে একটি করে সম্ভোগাচ্ছন্ন নারী। মৃত্যু থেকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য তাদের এই ব্যবস্থা। একটি প্রেমিকা তার প্রেমিককে বলছে পাশের বাড়ির সোনার বিড়ালটা তার চাই। তখন বিমর্ষ প্রেমিক গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। তার মনে হতে থাকে 'পশুরা তার চেয়ে আরো এক অর্থে সুখী, একটা সোনার বিড়াল জোগাড় করার দুশ্চিন্তায় কোন পশুকেই কখনো ভুগতে হয় না।'[৫০]

বস্তুত এই নগরের সবকটি লোক মৃত্যুকে ভুলে থাকবার জন্য অবিরাম ব্যস্ত রাখতে চায় নিজেদের। সারা রাত জেগে থেকে ভোরে নিজেদের ঠেলে দেয় এক সতর্ক ঘুম-ঘোরের মধ্যে। এরা যা কিছু করছে সবই মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে। মৃত্যুর এক দুর্বোধ্য আতঙ্ক বুকে করে বয়ে বেড়াচ্ছে। দিনরাত কেবল কাজের মধ্যে মগ্ন থাকে নিজেকে ভুলে থাকবার জন্য। একই কারণে বাড়ির সমস্ত ডিজাইন তারা অনন্ত কালব্যাপী সোনা দিয়ে মুড়তে থাকে।

এরই মধ্যে একটি ছেলের মৃত্যুতে এলাকার মানুষ প্রায় উন্মত্ত হয়ে পড়ে। তার মা ছেলের মৃত্যুশোকে কাঁদছে দেখে আর সকলে বুঝতে পারে যে, তারা এখনো পশু হতে পারেনি ! মানুষই আছে। এই ঘটনায় হিমার এক শয্যাসঙ্গিনী পশুর চেতনা ধারণ করে একবার ব্যাঙের মতো লাফাবার চেষ্টা করল। একবার ঘোড়াদের মত দাঁড়িয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল। মানুষের এই কার্য কলাপ আমাদের টেনে নিয়ে যায় এক অসম্ভবের জগতে।

হিমা এই মৃত্যুর এক অদ্ভুত কারণ বের করে। তার আত্মহত্যার জন্য দায়ী হিমার বাবা। কারণ তার বাবার পশুর মতো করে না বাঁচার ইচ্ছাটাই ওই ছেলেটিকে বিমর্ষ, হতাশাগ্রস্ত করে দিয়েছিল ! ফলে জীবনটা তার কাছে হয়ে গিয়েছিল উদ্ভট, নিরর্থক। পশুদের এমনটা মনে হয় না বলেই তারা কত নিশ্চিন্তে বাঁচে। আত্মহত্যা করতে চায় না। এই লোকগুলোর মনে হয় মনুষ্য জীবনই একটা বিরাট বড় ষড়যন্ত্র। মানুষের চেতনা নিয়ে বাঁচা যায় কেবল শৈশাবস্থায়। কেননা মৃত্যু সম্পর্কে তখনও কোনো জ্ঞান থাকে না মানুষের। তারপর মৃত্যুজ্ঞান হলেই সে খাঁচাকলে বন্দি হয়ে পড়ে।

আশ্চর্য যে লোকে এখানে যৌনতা করে যৌন সুখের জন্য নয়; মৃত্যুকে ভুলে থাকার জন্য। সন্তানের জন্ম দিতেও নয়, কেননা ছেলেপুলে হলে তাদের মতোই একটা কালো বিভীষিকার কবলে পড়তে হবে। থানার পুলিশ পর্যন্ত মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পায়। হিমা হিংস্র বাঘ হয়ে বাঁচতে চায় ! হিমার স্ত্রী রুচা ময়ূর হয়ে আমাজনের তীরে উড়ে বেড়াতে চায় ! এই রুচা উপন্যাসে একমাত্র মানুষ, যে ভাবে মরণের এত পথ যে তার সব কটাকে ভুলে থাকা অসম্ভব। মৃত্যু সম্পর্কে আলাদা করে ভাবার কোন দরকারই নেই বরং জীবনটাকে আরো ভালো করে ভোগ করা উচিত। আবার এই যৌন সুখে থাকাটাই যে মৃত্যুকে ভুলে থাকবার একমাত্র পথ নয়---সে কথা হিমার বাবা পুরো জীবন দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। তাই আজ বৃদ্ধ বয়সে পশু হতে চাওয়ার বাসনাটা সে বন্ধ করে দিয়েছে। এখানেই হিমার আপত্তি। ভাবতে অবাক লাগে মানুষগুলো দিন রাত অবিরাম ব্যস্ততা অর্থ ও সোনা সংগ্রহ, অঢেল খাওয়া-দাওয়া, অনন্ত যৌনতা, মদের হৈ-হুল্লোড় সব দ্বিগুণ উৎসাহে করে কেবল মৃত্যুকে ভুলে থাকবার জন্য ! এমনকি মানুষ চুরি করে অভাবে নয়, অবশিষ্ট সময় কাটাবার জন্য। যাতে মৃত্যুর চিন্তা মনে না আসে।

যৌনতাকে একমাত্র ভয় পায় হিমার বোন হেলা। তার যুক্তি হল যেহেতু যৌনতার ভেতর দিয়েই মানুষ জন্মায়, সুতরাং মানুষ জন্ম বন্ধ করে দিলে তারা সবাই মিলে পশুত্বে ফিরে যাবার ধ্যান করতে পারে। তার মতে 'লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনের ফলে পশু মানুষ হয়েছে, তেমনি মানুষের আবার পশুত্বে ফিরতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যেতে পারে।'[৫১] তাই হেলা স্বপ্নের মধ্যেই শুরু করে দেয় ছোটা। দীর্ঘ ছোটার পর ক্লান্ত হয়ে যখন সে বাস্তবে ফেরে তখনও স্বপ্নের ঘোরে ছুটে চলে সে। হেলার আর পশুতে ফিরে যাবার আরেকটি কারণ হল পশুদের ভেতর মানুষের মতো ধর্ষণ জিনিসটা নেই।

গল্পকথকের নিঃশব্দে অবয়বহীন ভাবে এলাকার প্রত্যেকটি বাড়ির অন্দর, জনপূর্ণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, অন্য বাস্তবতায় নিয়ে যায় আমাদের। কথক মৃত নয়, তবুও অবয়বহীন ভাবে সে সব কিছু প্রত্যক্ষ করছে। এমনকি এলাকার মানুষ গুলোর মনের ভেতরের চিন্তাভাবনাগুলো, রাত্রে দেখা স্বপ্নগুলোকেও পড়ে ফেলতে পারছে। এই অসম্ভব উপস্থিতির বাস্তবতায় আমাদের চমক লাগে, কিন্তু বেমানান লাগে না এতোটুকুই। অদ্ভুত এই লোকালয়ের মানুষগুলোর অন্দরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যথা,- ডায়েরি লেখা, রতিক্রিয়া, চৌর্যবৃত্তির মতো বিষয় গুলোর বর্ণনা দিতে এই অশরীরী

রূপের প্রয়োজন ছিল। গল্পকথকের এই চমৎকার আশ্রয়ই জাদুবাস্তবতার চমৎকার নিদর্শন।

ওই লোকালয়ে প্রতিবছর অমাবস্যায় নৃত্যোৎসব হয় এই মৃত্যু থেকে দূরে থাকতেই। হাজির হয় শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, উচ্চপদস্থ চাকুরে, প্রশাসক, চিকিৎসক, শিক্ষক, পুলিশ। তারা সবাই নাচে বিভিন্ন পশুর চেহারা ও স্বভাব নকল করতে করতে। কেউ স্থলচর, কেউ জলচর, কেউ উভচর, আকাশচর, স্তন্যপায়ী, সরিসৃপ, মাংসাশ, তৃণভোজী---বিভিন্ন জীবজন্তুর চেহারা ও স্বভাবকে নকল করতে লাগে। এমনকি গানের সুরগুলো বাজানো হয় বিভিন্ন পশুর চিৎকার দিয়ে। এই নৃত্য উৎসবের শেষের দিকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে একের নারী অন্যের হাত ধরে পালানো ও প্রচুর বাড়িতে চুরি মানুষের জীবনগুলোকে একেবারে ওলট পালট করে দিল। এতদিন ছিল মৃত্যুচিন্তা এবার তার সাথে যুক্ত হল মানুষের ভয়। আরো অনিশ্চিত হল জীবন। তার ওপর হেলার মৃত্যু এলাকাকে আরো গভীর আতঙ্কে ও বিষাদে ডুবিয়ে রেখে দিল। তারা আরও বেশি করে মগ্ন হল পশুত্ব ফিরে যাবার সাধনায়। কুকুরের ভেতর কোন গোপনীয়তা নেই, ব্যভিচার-মিথ্যাচার-বিশ্বাসঘাতকতাও নেই যা মানুষের আছে।

হিমার বৃদ্ধ পিতা বর্তমানের অসভ্যতামি থেকে মুক্তি পেতে এবার ফিরে যাবে সেই উৎসের দিকে। হাজার হাজার বছর আগেকার অতীত ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে,-

> ‘হঠাৎ তার মাথার ভেতর গোধূলির আলোয় অস্পষ্ট স্ফুলিঙ্গের মতো উড়ে গেল কিছু অদ্ভুত কল্পনা। সে যেন সেই দিনটায় উপস্থিত হয়েছে যেদিন মানুষ নামক প্রাণীকে প্রথম সৃষ্টি করা হচ্ছে। নবজাত শিশুকে আদর করার সময় মা যেমন তার সঙ্গে নানা কথা আপন মনে বলে যায়, সৃষ্টিকর্তা সেভাবেই নিজের মনে বকবক করতে করতে জগতের প্রথম মানুষটা গড়ছেন দূরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সব দেখছে।...
>
> অবাক না হয়ে লক্ষ্য করলাম সেদিনের অসমাপ্ত কল্পনাটাকে মাকড়সার জালের মত করে বুনে যাচ্ছে। সৃষ্টিকর্তা প্রথম মানুষটা গড়ছেন। গড়া শেষ হবার পর তিনি যখন তাকে ছেড়ে দিলেন, একহাত মাপের মানুষটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দু-পায়ে ভর দিয়ে টলতে

টলতে হেঁটে গেল, একেবারে নতুন ভঙ্গিতে, যার সঙ্গে কোন জীবেরই হাঁটার কোনও মিল নেই। আনন্দিত, অভিভূত হয়ে সৃষ্টিকর্তা শুধু তার হাঁটাটাই উপভোগ করে গেলেন। দিনের পর দিন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি তার সঙ্গে কথা বলছিলেন না, তাকে আর স্পর্শ করছিলেন না, তার উপর থেকে চোখও সরাচ্ছিলেন না। শুধু দেখে যাচ্ছিলেন তার হাঁটাটুকু। এভাবেই কয়েক হাজার বছর পার হয়ে গেল। প্রথম মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে, আর সৃষ্টিকর্তা তার হাঁটার ভঙ্গীটা উপভোগ করছেন।

বৃদ্ধ চোখ বুজে ফেলে। অবচেতনে কুণ্ডলীকৃত কল্পনাটাকে আরো স্পষ্ট ভাবে উপরে তুলে আনার চেষ্টা করছে। এটা মানুষের দুর্ভাগ্য যে সে কখনোই সম্পূর্ণ পশুর মতো হতে পারবে না কিংবা এটা তার অনন্ত সৌভাগ্য।'[৫২]

বর্তমানের দহনজ্বালা থেকে মুক্তি পেতে এই অতীতচারীতার বুননই হল ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম।

এই উপন্যাসে মুক্তির শেষ বয়ানটি গড়ে ওঠে এক ভৌতিক পরিমণ্ডলে, যখন একের পর এক ঘটে যেতে লাগল বিস্ফোরণের ঘটনা। একের পর এক বাড়ি ধ্বংস, মৃত্যু, আত্মহত্যা দেখতে দেখতে আতঙ্কিত লোকেরা আরো ধ্বংসকারী হয়ে উঠল। যৌনতার সুখ এখন তাদের কাছে গৌণ। পশুত্বের চরম সাধনা হিসেবে তারা রপ্ত করল হিংস্রতাকে। আতঙ্ক আর হতাশায় যখন গ্রস্ত পুরো নগর, তখন অন্ধকারে ধ্বনিত হতে লাগল এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর,-

'বন্ধুগণ ভালোবাসাটাই সব। যাদের মতো আমরা হতে চাই সেই পশুরা কি পরস্পরকে ভালোবাসে না ? একটা হরিণের দাঁত কি কখনো আরেকটা হরিণের গায়ের মাংস খুবলে নিয়েছে ?...সবাই এভাবে মারা গেলে লোকজন খুব কমে যাবে। সেই সুযোগে বিদেশীরা সহজেই আমাদের আক্রমণ করতে পারে।...পরস্পরকে ভালোবাসার ভেতর দিয়ে চর্চা করে গেলে আমরা সে পশুদের মত সুখী, উদাসীন, মৃত্যুভয়শূন্য জীবন লাভ করা থেকে খুব বেশি দূরে

থাকব না। সেটা আপনারা না জানলেও আমি তো জানি। বন্ধুগণ, আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'[৫৩]

বস্তুত মৃত্যুর ভয় নিয়ে এতটা ত্রস্ত একটা নগরী এই পৃথিবীতে আজও আছে কিনা আমাদের জানা নেই ! অথচ তাকে কেন্দ্র করে একুশ শতকে লেখা হল একটি গ্রন্থ। আসলে মৃত্যুভয় নামক একটি চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে লেখক মানুষের যে অবিরাম যৌনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, নীতিহীনতা---তার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ হেনেছেন। এগুলো এযুগে এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, মনুষ্য জীবন অসভ্যতায় ভরে গেছে। ভালোবাসা দিয়ে যে পৃথিবীটাকে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে তোলা যেত সেখানে ভালোবাসাটাই বিক্রি হয়ে গেছে। তাই লেখক বিভিন্ন চরিত্রের বাস্তবতার মুক্তির দিশা দিতে হঠাৎ হঠাৎ অতীতে ধাবমান হয়েছেন। যে সভ্যতায় এক কালে কোন হিংসা ছিল না, ছিল না কোন হিংস্রতা; বিশ্বাসঘাতকতা; লোলুপতা, উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই রুনার দৃষ্টিতে হঠাৎ করে আমাজনের ময়ূরী হয়ে ওঠা বা হিমার দৃষ্টিতে কয়েক হাজার পূর্বে পশুত্বে ফিরে যাবার স্বপ্নমগ্নতা বা বৃদ্ধর স্থিতধী কল্পনাইয় বিধাতার প্রথম মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস---ভীষণরকম প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

বাস্তব সমস্যার ভয়ংকরতা থেকে এই মুক্তির দিশাই আখ্যানটিকে করে তুলে জাদুবাস্তবময়। আলেহো কারপেন্টিয়ের 'উৎসের দিকে' রচনার অভিমুখই যেন আলোচ্য আখ্যানের গন্তব্য। সুস্থ ও সুন্দর জীবন প্রকৃতপক্ষে লুকিয়ে রয়েছে ঐতিহ্যে, আধুনিকতায় নয়---মায়াবী বাস্তবতার আধারে যেন সেই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন লেখক।

তিন

মৃত্যু ভয়কে কেন্দ্র করে 'রূপান্তরে'র মতো দেবর্ষি সারগীর আরেকটি নির্মাণ হল 'রাম রায়'(২০০৯)। 'রূপান্তরে' ছিল মৃত্যু ভয় থেকে মুক্তির জন্য প্রাণ সৃষ্টির উৎসের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রচন্ড আকুতি। আর 'রাম রায়' হল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর পৃথিবীর সঞ্চিত সম্পদ ও শিল্পবোধের অবধারিত মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে স্বপ্ন ও স্মৃতির জগতে পলায়ন। সেই অর্থে এখানে কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ববিহ্বল আভিঘাত নেই; নেই কোন বিপ্লবী আন্দোলন জনিত প্রতিরোধী বয়ান। আছে একুশ শতকীয় মানুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, যৌনবিকৃতি,

শিল্প সাহিত্যের প্রতি অনীহার রূপ। এবং সেখান থেকে মুক্তির নিমিত্তে স্বপ্ন ও স্মৃতিকে আশ্রয় করে স্থিতধী ভবিতব্য নির্মাণ। এই অসুস্থ সমাজে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাম রায় তাই রচনা করে স্বপ্নের মায়াজাল। একদিকে স্মৃতি অন্যদিকে স্বপ্ন আর মাঝে এক অলৌকিক মহাকালের সাক্ষী মহিষারোহীর আলাপনে রচিত হতে থাকে জাদুবাস্তবতার আখ্যান।

আখ্যানটির শুরু রাম রায়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে : 'অনেককাল আগে বসন্তপুর নামে এক বিখ্যাত প্রাচীন গ্রামে রাম রায় নামে একজন অভিজাত বৃদ্ধ এক বৃষ্টির বিকেলে কুয়োর মতো কোনো অতলান্ত স্বপ্ন দেখতে দেখতে মারা যান।'[৫৪] বস্তুত মৃত্যুপথযাত্রী একটি মানুষ মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছেও স্বপ্ন দেখছে ! কি স্বপ্ন ? কেনই বা স্বপ্ন ? স্বভাবতই প্রশ্নগুলো ধাক্কা মারে পাঠকের চেতনায়। স্বপ্ন দেখার পেছনে তার দুটো ভয় কাজ করছিল। এক, মৃত্যু ভয়। তবে মৃত্যুর জন্য নয়। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের জগৎটাও তার কাছে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে, এক গভীর কালো অন্ধকারে ঢেকে যাবে এটাই ছিল তার ভয়। আর দুই, তার তিন সন্তানের ক্রমান্বয়ে নৈতিক অবক্ষয়ে যখন তারা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার শূন্য হয়ে যাবে; তখন তার সারা পৃথিবীব্যাপী সংগৃহীত স্থাপত্য ও শিল্পবোধের পরিচর্যা কে করবে ? তা কি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ? অস্থিরতার এই সংকট বোধ সম্পন্ন যে কোন মানুষেরই সংকট।

এই সংকটে পরিবারের ভালোবাসা থেকে বিচ্যুত সাতাত্তরের রাম রায় কথা বলবার জন্য হাজির হত এক অস্তিত্বহীন অস্তিত্বের দ্বারে। কখনো শুধু হাসি শুনতে পাওয়া না দেখা মুখোশের হাসি, কখনো সশরীরে না দেখা দেওয়া অজানা মহিষারোহী, কখনো বা স্বপ্নে পাওয়া তার ভালোবাসার বিড়ালগুলো মুখর হয়ে হাজির হতো তার চেতনার দ্বারে। ধীরে ধীরে তার আলাপনের একমাত্র সঙ্গী হয়ে দাঁড়াবে গাঢ় গোধূলিতে আসা এক অদৃশ্য মহিষারোহী। রাম রায়ের বেহালার সুর-মূর্ছনা যিনি পাগলের মতো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনবেন। অতঃপর যত গভীরে আমরা প্রবেশ করব দেখব, আখ্যানের গায়ে লাগবে মায়াবী বাস্তবতার রং। উপন্যাসের পাঁচ নম্বর অধ্যায় থেকে শেষতম উনিশ নম্বর অধ্যায় পর্যন্ত আমরা দেখব একটি আখ্যানে কি পরিমাণে জাদুবাস্তবতার বুনন থাকতে পারে।

মৃত্যুপথযাত্রী রামরায়ের সঙ্গে মহাকালের দর্শক মহিষারোহীর একটি কথোপকথন

দেখা যাক। গাঢ় গোধূলি। ঘরের মধ্যে রাম রায়। জানালার বাইরে অন্ধকারে মহিষারোহী :

> 'আজ বেহালা বাজাবে না ? সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।
>
> রাম রায় আস্তে আস্তে চোখ তুলে দেখেন মহিষারোহী। পেছনে গোধূলির গাঢ়তা। এই সময় আকাশে আর কিছু থাকে না। সূর্য না, চাঁদ না, তারারাও না। মহাবিশ্ব এই সময় যেন একটু প্রাগাঢ় বিশ্রাম নেয়, একটু ঘুমোয়।
>
> 'আজ বেহালা বাজাবে না,' মহিষারোহী আবার জিজ্ঞেস করে। মুখে স্নিগ্ধ হাসি।
>
> 'কিছুই ভালো লাগছে না,' রাম রায় বললেন বিষাদময় গলায়। মহিষারোহী চুপ করে থাকে।
>
> 'কাল মাঝরাতে দেখি ওরা দুজনে আমার বড় ছেলেকে খুন করার চেষ্টা করছে। হয়তো খুনই করছিল ওরা। বা ভয় দেখাচ্ছিল। কে জানে।'...
>
> 'বেঁচে থাকার ব্যাপারটা যেন একটা অস্থির ঝড়ের মতো,' রাম রায় বললেন।...
>
> 'কাল সারাদিন নিশ্চয়ই নিজের পুরনো প্রিয় জিনিসগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলে ?' মহিষারোহী যেন একটু মজা করে জিজ্ঞেস করে।
>
> 'শুধু তাই নয়, কাল সারারাত দোতলা ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি।... ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে ওপরে উঠেছিলাম। শেষ পর্যন্ত বসে বসে ওদের শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করে গেলাম। জীবন থেকে অনেক কিছু চিরকালের জন্য শুধু মৃত্যুর পরেই হারায় তাই নয়, জীবদ্দশাতেও হারিয়ে যায়।' রাম রায় চুপ করলেন। মহিষারোহীর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বেহালাটা হাতে নিলেন। তারপর জানলার কাছে এসে বাজাতে লাগলেন। আশ্চর্য সুর। মহিষারোহী আবিষ্ট হয়ে শুনে গেল। রামরায়ের দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়াচ্ছিল।'[৫৫]

রাম রায় ও মহিষারোহীর একটা ঘোরের মধ্যে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বময় এই কথোপকথন আমাদের স্তব্ধ করে দেয়।

বাস্তব পৃথিবীতে বাঁচতে বাঁচতে, সবকিছু দেখতে দেখতে বাস্তবের প্রতি তার ঘেন্না ধরে গেছে। তাবলে সাদাত হাসান মান্টো বা মির্জা গালিবের মতো মৃত্যুর পর কবরে শুয়ে জীবনকে পুনর্মূল্যায়ন করতে সে নারাজ। তাই জীবদ্দশাতেই সে শান্তি পেতে বার বার ফিরে যায় অতীত স্মৃতির কাছে। স্বপ্নের ফেরি করে বেড়ায়। আনমনে যখন বেহালায় সুরের ঢেউ তোলে, তখন সে ফিরে যায় তার শৈশবে। যেমন একদিন মাঝরাতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে পৌঁছে যায় তার ষাট বছর আগেকার ভালোবাসার মিনুর বাড়ির কাছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে অতীতের কিছু স্মৃতি শুধু স্মরণ করতে চাইছে অস্থিরতা থেকে দুদণ্ড শান্তি পাওয়ার জন্য। পরদিন সে আবার বেরোয় সেই শিব মন্দিরের খোঁজে, যেখানে ষাট বছর আগে খোদাই করেছিল তার ভালোবাসার নারী মিনুর নাম। কিন্তু সে গুলিয়ে ফেলল। হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে হাজির হল সেই মহিষারোহী :

> ‘তুমি যা হারিয়েছে বলে ভাবছ, তার কিছুই হারায়নি,’ মহিষারোহী বলল। সবই ঠিকই আছে আমার স্মৃতিতে। আমার সঙ্গে এসো।’...
>
> ‘শিবমন্দিরের সিঁড়িতে তুমি মিনুর নামটা খোদাই করেছিলে মন্দিরের ডানদিকে নয়, বাঁদিকের পঞ্চম ধাপে। নামটা এখনও আছে। দেখবে ?’
>
> পকেট থেকে বার করে টর্চের আলো ফেলে রাম রায় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ‘মিনু’ নামটার দিকে। তাঁর আস্তে আস্তে মনে পড়ছে।
>
> ‘আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি কে ! ‘ মহিষারোহীর হাত দুটো ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বললেন। ঝড় তখনও প্রবল বেগে হয়ে যাচ্ছিল।...
>
> ‘তোমার মৃত্যুর পর একটা মুখ জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এ কথা ঠিক। কিন্তু ওটা টিকে থাকবে আমার স্মৃতিতে। শেষ পর্যন্ত সবই টিকে থাকে আমার স্মৃতিতে। জগতের প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি বস্তু।’[৪৫]

বস্তুত রহস্যময় ঝড়ের রাতে অতর্কিতে পথ দেখানো মোষের আবির্ভাব রহস্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়। বাস্তবের এক দিশাহীন মানুষকে সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য এই মহিষারোহীর উপস্থিতির এই যে বয়ান, একেই আমরা বলব ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম।

পরের সারাদিন রাম রায় বসে বসে শুধু ভাবতে থাকে সত্যিই কি মহিষারোহীকে সে স্পর্শ করেছিল। নাকি সবটাই স্বপ্ন ! তার ব্যক্তিগত স্বপ্নগুলো মহিষারোহী মস্তিষ্কে জমা হয় কিভাবে ? তাহলে এক জোড়া দৃষ্টি অদৃষ্ট থেকে তাকে কি সর্বদাই নজরদারি করে চলেছে। ভাবনার ভেতর চাপতে থাকে ভাবনা। মৃত্যুর পর তার সংগৃহীত মূল্যবান স্থাপত্যগুলো অকর্মণ্য ছেলেগুলো আদৌ রাখতে পারবে কিনা ভাবতে ভাবতে টের পায় অদৃশ্য মহিষারোহী জানালায় হাজির হয়েছে। রাম রায় একে একে তার মায়া সভ্যতার ঘড়ি, ফুলদানি, রুপোর ডিনারসেট, সোনার কলম ও নর্তকীগুলো মহাকালের হিসাবরক্ষকে দিয়ে বলল : 'এগুলো নাও। তোমার কাছে থাকলে এরা অন্তত চিরকাল থাকবে।'[৫৭] অতঃপর ঘটনাক্রমটি দেখলে আমরা দেখব ম্যাজিকের ভেতর প্রবেশ করছে ম্যাজিক। বাইরে তখন ভরা জ্যোৎস্নার রাত :

> 'একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাম রায়ের দিকে। তারপর তার ঠোঁটে ফুটে উঠল স্নেহার্ত হাসি।...
>
> দেখি---আমি ওদের রাখতে পারি কি না।' দুই হাত অঞ্জলির মতো করে বাড়িয়ে জানলার শিকের ভেতর দিয়ে সে ওদের একে একে নিল এবং নিজের কোলে রাখল। তারপর চলে যাওয়ার জন্য নড়ে ওঠতেই জিনিসগুলো তার কোল থেকে নীচে পড়ে যেতে লাগল। ওদের কুরিয়ে নেওয়ার জন্য সে মোষের পিঠ থেকে নামল। কিন্তু নীচু হয়ে প্রথমে ঘড়িটা ছুঁতেই ওটা হঠাৎ জোরে জোরে গড়াতে লাগল, যেন প্রবল হাওয়ায় একটা শুকনো পাতা গড়াচ্ছে। মহিষারোহী ফুলদানিগুলোর একটা তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু মসৃণ, সুডৌল শরীর নিয়ে ফুলদানিটা তো প্রায় চাকার মতো জোরে গড়াতে লাগল। ছ'টা ফুলদানির ছটাই। হাতির দাঁতের ছোট ছোট স্পর্শকাতর নর্তকীরা তো নাচতে নাচতেই দূরে পালাতে লাগল, যেন এখানে এতদিন বন্দি ছিল ওরা, আজ ছাড়া পেতেই বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। হতবাক হয়ে রাম রায় লক্ষ করলেন মাঠটায় মহিষারোহী

তার প্রিয় জিনিসগুলোর পেছনে জোরে জোরে হাঁটছে, আর ওরা সবাই এদিক-ওদিক গড়িয়ে চলেছে। সে কিছুতেই ওদের ধরতে পারছে না। কিন্তু বিস্ময়ে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন যখন দেখলেন যে আকাশ থেকে হঠাৎ বড় বড় ঈগলের মতো দেখতে সাদা, নীল ও গোলাপি রঙের কিছু অদ্ভুত পাখি নেমে এল। তারপর ছোঁ মেরে রূপোলী মাছ ধরার মতো করে জিনিসগুলোকে নিজেদের ঠোঁটে তুলে নিয়ে একে একে আকাশে উড়ে গেল। জোৎস্নার আলোয় ওদের প্রসারিত বিপুল ডানাগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন আকাশের কোনও যান আবার আকাশে ফিরে যাচ্ছে। অনুতপ্ত, সংকোচভরা মুখে মহিষারোহী ফিরে এসে জানালায় দাঁড়াল। রাম রায় তখন যাতে মূর্ছা না যান তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। টলতে টলতে তিনি এগিয়ে গেলেন জানালার একেবারে কাছে। কাঁপতে থাকা হাতদুটো জোড়া করে তিনি ব্যাকুলভাবে বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করো ! আমাকে ক্ষমা করো !

চাঁদের আলো মুখে পড়েছিল বলে নিজের ভেজা দৃষ্টি দিয়ে তিনি এই প্রথম স্পষ্ট দেখতে পেলেন মহিষারোহীর মুখের বেদনাও।'[৫৮]

শেষ পর্যন্ত গভীর বেদনা নিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্নে, উঁচু পাহাড় থেকে বিশ্বপ্রকৃতির ভূপৃষ্ঠে মৃত্যু দেখতে দেখতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রাম রায়। ঘটনা পরম্পরা এরপর খুব দ্রুত লয়ে চলতে থাকবে। দেখা যাবে আস্তে আস্তে মানুষের স্মৃতি থেকে কেবল রাম রায়ই নয়, তাদের পুরো বাসস্থানটাই লোপাট হয়ে গেছে। সেই ভগ্ন ঘরে রাম রায়ের আরো অনেক পুরানো হারানো স্মৃতি নিয়ে হাজির হবে সেই অদৃশ্য মহিষারোহী। ছায়ায় নির্মিত বলে কেউ তাকে দেখতেও পাবে না। সে রাম রায়ের স্মৃতি রোমন্থন করে গোধূলিতে জানলার ধারে মনে মনে তার বেহালাও শুনবে। বসন্তপুরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার গোটা জীবনটাকেই চোখের সামনে দেখতে পাবে মহিষারোহী। শুনে যাবে রামরায়ের সঙ্গে হওয়া তার সংলাপগুলো। রাম রায়ের বিদেশ ভ্রমনের স্মৃতিগুলো। এভাবে ইচ্ছে করলেই সে রাম রায়ের সান্নিধ্য উপভোগ করতে থাকল। দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়ায় থাকতে থাকতে একঘেয়েমি লাগল। এখান থেকে মুক্ত

হতে লেখক মহিষারোহীর স্মৃতি রোমন্থনে নিয়ে এলেন আর এক বিকল্প বাস্তবতা। তার উত্তুঙ্গ কল্পনা এবার ছুটবে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। দেখবার চেষ্টা করল রাম রায়ের পরবর্তী জন্মগুলোর কর্মজগৎ :

> 'এই মুহূর্তে মহীশুরের ঢেউ খেলানো চওড়া রাস্তায় জোরে মোটরবাইক চালিয়ে চলেছেন তিনি, রোদে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে, এবং বসন্তপুরের রাম রায়ের চেয়ে বেশি ফর্সা ও স্বাস্থ্যবান। এখানেও তিনি স্থপতি। খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রাসাদের আদলে ছোট ছোট বাড়ি নির্মাণের দক্ষতায়। এ ব্যাপারে তিনি কাজে লাগাচ্ছেন শুধু প্রাচীন ভারতীয় নয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গড়া য়োরোপীয় প্রাসাদের নকশাও। মধ্যবিত্তদের জন্য নির্মিত এই ছোট ছোট প্রাসাদগুলো মহীশূর শহরটাকে আরও স্বপ্নতুল্য করে তুলেছে, যেন এখানে যারা বাস করে তারা সবাই রাজা।'...
>
> সূর্যাস্তের অনেক আগেই মহীশূরের রাম রায় মোটরবাইক চালিয়ে শহরের কেন্দ্রে চলে এলেন, তারপর একটা বার-এ বসে মদ খেতে লাগলেন। মহিষারোহী তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিল এই রাম রায়ের চোখেমুখে স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে, অটল আত্মবিশ্বাস আছে, কিন্তু নেই কোনও গোপন, গভীর, সূক্ষ্ম স্বপ্ন ও অসহায়তা, অনির্বচনীয় শূন্যতাবোধ।'[৫৯]

কল্পনার ভিতরে আরও গভীর কল্পনায় ঢুকতে থাকে আখ্যান। মহিষারোহীর দুর্লঙ্ঘনীয় দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। নানা দেশের নানা মানুষের মধ্যে নির্মিত হতে থাকবে বসন্তপুরের রাম রায়। তাঁর অদৃশ্য দৃষ্টি ধাবিত হবে এবার নিউইয়র্কে। সেখানে রাম রায়কে দেখব একজন পাক্কা ব্যবসায়ী। আকাশচুম্বী একটি প্রাসাদের মধ্যে পার্টিতে ব্যস্ত। তারপর স্বপ্নের হাত ধরে সোজা লন্ডনের লাইব্রেরিতে পাঠরত রাম রায়। তখন সে একজন ব্রিটিশ দর্শনের অধ্যাপক। যুক্তিশাস্ত্রের আক্রান্ত চর্চাকে পাশে ফেলে নিঃসঙ্গ থাকতে চায়। তার ঠিকানা একটি কারুকার্যময় লেকে ও লেকের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা একটি স্তব্ধ শহর। অনেকদিন পর্যবেক্ষণ করলেও মহিষারোহীর মন শেষ পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকল বসন্তপুরের রাম রায়ের এর জন্য।

অতঃপর মহিষারোহী যায় তিব্বত। তিব্বতের রাম রায় যেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। বৌদ্ধ ভাবনার শূন্যতা, ক্ষণস্থায়ীত্ব, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষার গভীর উপলব্ধি থেকে তার ভেতর সৃষ্টি হয়েছে এক আশ্চর্য নিষ্ক্রিয়তার বোধ। ফলে তার এখন কোন গভীর আকাঙ্ক্ষা নেই, তৃষ্ণা নেই, দুঃখ নেই। একদম গাছপালার মত বেঁচে থাকে। এই রাম রায়কে দেখেও মহিষারোহীর মন ভরে না। আরো কিছুকাল মহিষারোহী রাম রায়ের পরবর্তী জীবনগুলো অনুসরণ করে গেল। রাজস্থানে একজন কৃষকের রূপে। জেরুজালেমে একজন ধনী ব্যবসায়ীর রূপে। তুরস্কে নিষ্ঠুর সৈনিকের রূপে। কলকাতায় একজন বেকার যুবকের রূপে। পেরুতে একজন পুরাতাত্ত্বিক রূপে।

কিন্তু মহিষারোহী যে রাম রায়কে হারিয়েছে এদের কারো ভিতর তাকে দেখতে পায়নি মহিষারোহী। বসন্তপুরের রামরায়ের জগৎ ও জীবনের প্রতি যে অনুরাগ, যে শিল্পবোধ ছিল, প্রিয় বন্ধু চিরকালের জন্য হারানোর যে বেদনা বোধ ছিল, তা এদের কারোর মধ্যেই পায়নি। বর্তমানের থেকে আখ্যানের তুলকালাম দৌড় শুরু হবে আরো ভবিষ্যতের দিকে। সে জার্নিতে যে সংস্কার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে এক কালে মানুষ বেঁচে ছিল; তার কোন অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। মহিষারোহীর সঙ্গে একটা দীর্ঘ জার্নিতে আমরা দেখলাম, বাঁচার একটি বিকল্প বাস্তবতার বিকল্প পথ তৈরি হল না। সেই উদ্দেশ্যে আখ্যান এবার ছুটতে থাকবে আরো হাজার হাজার বছর বা তারও কয়েক হাজার বছর পরের কোন সময়ের গর্ভে। মাঝের এই জগতের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মুহূর্ত সব লিপিবদ্ধ হতে থাকে তার অপরিসীম স্মৃতিতে। এই সভ্যতা কখনো ধ্বংস হয়ে গেলেও সমস্ত ঘটনা তার স্মৃতিতে থেকে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দেখা যাবে মহিষারোহী ওই ঘন কুয়াশায় ডুবে যাচ্ছে আরো অনেককাল চলবার পর কুয়াশা যখন একটু ফিকে হয়ে এলে মহিষারোহীর সাথে আমরাও অবাক হয়ে দেখব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বসন্তপুরের রাম রায়ের জীবন ও জনপদ অবিকল রূপে ফিরে এসেছে। ব্যাকুল উদ্বেলিত হৃদয়ে মহিষারোহী এগোতে লাগল রামরায়ের বাড়ির দিকে :

> ‘সেই শিবমন্দিরটা এল। জমিদারের বাড়িগুলো এল। প্রাচীরে ঘাস গজানো সেই কুয়ো। কোন এক সুলতানের ভাঙা গড়া আস্তাবলটা। মাঠটার কাছে যখন সে পৌছঁল, দূর থেকে দেখতে পেল রায়ের বাড়ি একটা ঈগলের প্রসারিত ডানার মতো করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে।

জানালার কাছে এসে সে দেখে রাম রায় চোখ বুজে বেহালা বাজাচ্ছেন। সেই মুখ, সেই ভঙ্গি। বেহালায় সেই আশ্চর্য সুর। এবং সেই ঘর। মহিষারোহীর চোখ ভিজে উঠতে চাইল।

বাজনা শেষ হবার পর রাম রায় দেখেন জানলার ওপাশে একজন মহিষারোহী।

'চিনতে পারছ ?' সে জিজ্ঞেস করে।

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাম রায় ঘাড় নাড়িয়ে জানালেন সে চিনতে পারছেন না।

মহিষারোহী হাসল।

'আমার বড় অসুখ হয়েছে। শিগ্‌গির মারা যাব।'

'কিন্তু আবার তো জন্মাবে ?'

'তবু এই জীবনটা তো আর ফিরে পাব না।' এটা চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

'হবে না, কারণ আমার স্মৃতিতে টিকে থাকবে। কিংবা কোনও একসময়, জগতের কোন এক জায়গায় তোমার এই জীবনটাই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এখন যেমন ঘটল।'

বিহ্বলিত কণ্ঠস্বরে মহিষারোহী এরপর রাম রায়কে বলতে লাগল অতীতের বসন্তপুরের সব ঘটনা।...

রাম রায় স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলেন।

'কিছু বলছ না যে ?' সে জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে ক্ষমা করো ! 'অনেকক্ষণ পর জড়ানো গলায় তিনি বললেন। 'তুমি যা বলছ তা নিশ্চয়ই সত্যি। তবু বলছি, তোমাকে এর আগে কখনো দেখেছি বলে আমি জানি না। মহাকালের কোনও এক অনিশ্চিত বিন্দুতে ঠিক এইরকমই একটা জীবন আমি এর আগে কাটিয়েছি কিনা আমার মনে নেই। তেমনি, অনিশ্চিত কোনও এক ভবিষ্যতেও যদি কখনো এই জীবনটা আবার ফিরে পাই, তখনও এখনকার কথা আমার কিছু মনে থাকবে না।'[৬০]

এই অলীক সংলাপে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা এগিয়ে চলি বর্তমান থেকে দূর বহুদূর অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। জাদুবাস্তবতার বয়ানগুলোই হয় এমন ঘোর লাগা।

বস্তুত মহিষারোহীর ভাষ্যে সময় প্রতিনিয়ত আমাদের পরখ করে চলেছে। কিংবা কোন অদৃশ্য নয়নের বাইরে আমরা কেউই নেই। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, কর্মসংস্কৃতি, সাফল্য, ব্যর্থতা, মহাকালের স্মৃতিতে ঠিক সঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। তাই বর্তমানে আমাদের কাজ বসন্তপুরের রাম রায়ের মত সৌন্দর্যচর্চা, রসবোধ, ও শিল্পবোধের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া। সেই স্মৃতিই হয়তো পরে---বহু পরের ভবিতব্যে আমাদের সুস্থ জীবনবোধ নির্মাণে সাহায্য করবে। সময়কে এক মহকালের অলঙ্ঘনীয় পরিধিতে স্থাপন করে, নানান স্বপ্ন ও স্মৃতির পরিসর দিয়ে এক বিকল্প বাস্তবতার গ্রন্থনে গ্রথিত করা হয়েছে।

প ঞ্চ ম প রি চ্ছে দ

রবিশংকর বল : স্বপ্ন, স্মৃতি ও সময়ের জাদুময় বিন্যাস

এক

নির্বাসিতের কোন আত্মকথা হয় না, একজন নির্বাসিতের থাকে শুধু স্মৃতি আর স্বপ্ন। শাসকের স্টিমরোলার যখন একটি মানবাত্মাকে পিষে দিয়ে চলে যায়, তখন তার বাঁচার একমাত্র আশ্রয় স্বপ্ন আর স্মৃতির কাছে নতজানু হয়ে থাকা। রবিশংকর বলের (১৯৬২-২০১৮) 'স্মৃতি ও স্বপ্নের বন্দর' (২০০৬) হল বিশ্বব্যাপী নির্বাসিতের তেমনই একটি দরদী আখ্যান।

উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে এক অদ্ভুত স্বপ্নের বয়ান দিয়ে। স্বপ্নটি দেখছেন নির্বাসিত এক লেখক। 'ভুডুর স্বপ্ন'। এই ভুডু তার কাছে উইচক্রাফট বা ব্ল্যাক ম্যাজিক। তাঁর

নির্বাসিত যন্ত্রণাময় জীবনে শান্তি এনে দেবে---এমন একটা স্বপ্নের সন্ধানে ব্যস্ত থাকেন তিনি। ফলে রোজ রাতে স্বপ্ন দেখা তাঁর একটি অভ্যাসে পরিণত হয়। আর এইসব নামগুলো লিখে রাখে ডায়েরির পাতায়।

বস্তুত ব্যস্ত এই জগত সংসারে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার রসদ তিনি সংগ্রহ করেন রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে, রামপ্রসাদের গান থেকে। তারপর শৈশবকে নিয়ে নাড়াচাড়া। কিন্তু তারপর ? তার বাঁচার আশ্রয় কি ? তখনই শুরু হয় নৈরাশ্যময় এই রাজ্য থেকে পাততাড়ি গুটানো। স্বপ্নে তিনি পাড়ি দেন স্বপ্নময় এক স্বপ্নের দেশে। যে স্বপ্ন কখনো পৌঁছে দেয় আফ্রিকার কালো মানুষদের দেশে, কখনো লাতিন আমেরিকার দেশে, কখনো বা এই জগৎসংসার থেকে আরও...আরও... দূরে নিস্তরঙ্গ জলের সমুদ্রের গভীরে :

> ‘একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমার আর এক অ্যাগনেসের মৃতদেহ সমুদ্রের তলদেশে পড়ে আছে। মাছেরা এসে আমাদের মাংস খুবলে খেল, কতরকম পোকা এসে আমাদের পচাগলা শরীরে বাসা বাঁধল, কতদিন চলে গেল বলা যায় না, একসময় আমার ও অ্যাগনেসের কঙ্কাল দুটি পড়ে রইল, জলের ভিতরে থাকতে থাকতে কী আশ্চর্য সাদা হয়ে গেল আমাদের অস্থিগুলি, জলের ঢেউয়ে মাঝে মাঝে দুটি কঙ্কাল দোল খায়, আমাদের হাড়ের খাঁচার ভিতর দিয়ে মাছেরা আসা-যাওয়া করে, আমাদের চোখের কোটরে শামুকেরা এসে ঘুমিয়ে থাকে, আরও অনেক দিন পর আমাদের হাড়গোড়ের রং ঈষৎ সবুজ হয়ে উঠল, আমাদের কঙ্কালের ওপর শ্যাওলা জন্মাতে লাগল, শুধু শ্যাওলা নয়, আরও নানা সামুদ্রিক উদ্ভিদ।’[৬১]

এই স্বপ্নটি কথককে এক গভীর শান্তি দিয়েছিল। তারপর থেকে পাখিদের ভাষা, গাছেদের ভাষা, আয়ত্ত করে এক অদ্ভুত অনুভূতি ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল তাঁর। এই হল জাদুবাস্তবতা। সমুদ্রের জলের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা থেকে শুরু থেকে মহাকাশে একটি নক্ষত্রের সাথে কথা বলা, অদ্ভুত এক জগতে তার বাস সবকিছু শুধু নির্বাসিতের যন্ত্রণাকে ভুলে থাকবার জন্য।

বাংলাদেশের বরিশালে ছিল তার বাড়ি। কুড়ি বছর ধরে নির্বাসিত জীবনে শুধু দেশ থেকে দেশান্তরে, এক কাঁটাতার থেকে আরেক কাঁটাতারে, কুকুরের মত শুধু

ছুটেছে। বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুদের বেঙ্গলের ধুবুলিয়া ক্যাম্প বা দণ্ডকারণ্য যখন পাঠানো হচ্ছিল, তখন তার রক্ত সম্পর্কের শেষ বন্ধনটুকু কেটে গিয়েছিল। তখন মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় যেন সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডিম। ঘুমের ঘোরে অচেতন না হলে তার মনে পড়ে গ্রীষ্মের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সেই আবিসিনিয়ায় ছেলেটার কথা; যে নিজের দেশে ফিরতে চেয়ে কাঁটাতারের সীমানায় পুলিশের গুলির গন্ধ বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মনে পড়ে নির্বাচিত সেই প্যালেস্টাইনি কবি রশিদ হোসেনের কথা, যিনি সারা পৃথিবী ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিলেন। দমবন্ধ হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার স্মৃতি ধাবিত হয় ১৯৭৩ সালের ১১-ই সেপ্টেম্বরের লাতিন আমেরিকায়। সিআইএ সমর্থনে জেনারেল পিনোচেতের অভ্যুত্থানে যেদিন চিলিকে ধ্বংস করা হল। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আইয়েন্দেকে খুন করে দখল নিল চিলির। কাতারে কাতারে মানুষ কোথায় সব হারিয়ে গেল। শুধু চিলি নয়; গুয়াতেমালা, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, পানামা, মেক্সিকো, কলম্বিয়া---কোথায় না সন্ত্রাস চালাইনি এই সিআইএ। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল শুধু রাষ্ট্রের জন্য। মানুষের ইতিহাসে গত শতকে যত না মানুষ নিরাশ্রয় হয়েছে, নির্বাসিত হয়েছে সব থেকে বেশি। এমনটা আর কখনো হয়নি।

এই গল্পকথক লেখকের মনে হয়, এই পৃথিবীতে যুদ্ধ হয় রাষ্ট্রের কারণে। তারপর প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে নির্বাসন। তাহলে নির্বাসিত মানুষের রাষ্ট্র কোথায় ? দেশ কোথায় ? তখন লেখক তার অনুভূতি শক্তিতে জানাবেন ইথাকা :

> '---ইথাকা একটা স্বপ্ন ডক্টর। নির্বাচিত মানুষের স্বপ্ন। তার দেশ।
> ইথাকা তার একমাত্র স্মৃতি।
> ---ইথাকা এখন কোথায় ?
> ---কোথাও নেই।
> ---তাহলে আপনি কোথায় যাবেন ?
> ---কোথাও না। ওটাই আমার দেশ ডক্টর, এই পৃথিবীতে যা কোথাও নেই।
> ইউলিসিস... ইউলিসিস...।'[৬২]

কথক-লেখক যে হাসপাতালে রয়েছেন, সেই হাসপাতালে যে সিস্টার---সেই হাসপাতালে যে লোকটি দাড়ি কাটার কাজে যুক্ত, আজ তারাও গ্রাম ছাড়া। তাদের গ্রামের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। সেখানে গড়ে উঠেছে বাবুদের বড়ো বড়ো রিশর্ট। তারাও নিজ বাসভূমে থেকে নির্বাচিত।

উপন্যাসে এই কবির লড়াই পৃথিবীর সমস্ত নির্বাসিতের প্রতিনিধি রুপে। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এর প্রাক্কালে তিনি শুধু এই স্বপ্নের জগতে পাড়ি জমান। শুধুই স্মৃতি হারানো ঐতিহ্যের কাছে। ফিরে যান লড়াইয়ের শক্তি মজুত করবার জন্য। যে ইতিহাস ক্রমে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে। আজ তার লড়াই তারই বন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে। সেই রাষ্ট্রপ্রধানের সাহায্যে যখন কুড়ি বছর আগের নির্বাসিত জীবনে ফিরে যাচ্ছেন তিনি; ফিরে যাচ্ছেন তাঁর সেই ছোট্টবেলার সুন্দর গ্রামে। হঠাৎ দেখি পুরো গ্রাম আজ একটি শ্মশান। শত শত নির্বাসিত মানুষের কণ্ঠস্বর তাকে ঘিরে ধরেছে। শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন---আরো প্রশ্ন। স্মৃতির গভীরে---আরো গভীরে নিঃশব্দে যেতে যেতে হঠাৎ আমাদের খেয়াল হল আসলে এই কথক-লেখকও কবে মারা গেছে। আর মৃত আত্মা তাঁর কবিতার ভাষা দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে এতক্ষণ শুধু বিপ্লবের কথা শুনিয়েছিলেন।

আমাদের মনে পড়বে হুয়ান রুলফোর 'Pedro Paramo'-র কথা; যেখানে আমরা দেখব হুয়ান প্রেসিয়াদো তার বাবার কাছে চলেছে তার প্রার্থিত অর্থ আদায় করতে। গিয়ে দেখে পুরো কোমালা অঞ্চলটি ভুতুড়ে হয়ে গেছে। এবং আর একটু এগুলে আমরা দেখবো, হুয়ান প্রেসিয়াদোই মরে কবে ভূত হয়ে গেছে। আর আমরা যারা সমাজের অংশ বা যারা পাঠক আমাদেরও চেতনা কবে মরে গেছে। নইলে আমরা ভূতের কাহিনি শুনছি কেমন করে ? আর যদি মরে নাই বা থাকি, তাহলে আমরা প্রতিবাদ করছি না কেন ? পরপর এতগুলো পৃথিবীব্যাপী অন্যায়ের বিরুদ্ধে ? এটাই হল ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের ভুবন। যেখানে শাসকের সীমাহীন অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের বীজ লুকানো থাকে।

দুই

বিশ শতকের ঘটে যাওয়া বাঙালির সব থেকে বড় বিপর্যয় দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। একুশ শতকে পৌঁছেও যার ক্ষত সারানো যায় না। পিতৃভিটের প্রতি প্রাণের টান

অনুভূত হয় অনুভবের উষ্ণ স্রোতে। রবিশংকর বলের 'ছায়াপুতুলের খেলা' (২০০৮) উদ্বাস্তু সমস্যারই একটি প্রতিবিম্বিত রূপ। উদ্বাস্তুদের হৃদয়ের কান্না বিশ শতকের প্রচুর উপন্যাসেও কান পাতলে শোনা যাবে। কিন্তু আখ্যান চয়নে স্মৃতিকথার সাধারণ বিন্যাসই এসেছিল কাঠামোতে। আর একুশ শতকে উদ্বাস্তুর চেহারা নির্মাণ করতে গিয়ে স্বপ্ন, স্মৃতি এমন এক সময়হীন কাঠামোর গোলোকধাঁধাময় প্লটে উপস্থাপিত হয়েছে যে, আমরাও এক দুঃস্বপ্নের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে---হয়ে পড়ি উদ্বাস্তুর শরিক। 'ধূলিচন্দন'-এর পর 'ছায়াপুতুলের খেলা' পড়ার পরও মনে হবে ঘোর লাগা আবেশের তারটা কে যেন কেটে দিল।

আখ্যানের সূচনা থেকে গল্পকথক বারবার এক অমোঘ আকর্ষণ বোধ করে তার পৈতৃক এক পুরানো আমলের বাড়ির প্রতি। বাড়িটি ছিল বাংলাদেশ থেকে উদ্ভূত হওয়ার পর ভারতের প্রথম আশ্রমের ঠিকানা। কোনরকমে টিন দিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই গড়েছিলেন হাজার হাজার আশ্রয়হীন মানুষ। শহরের ভিতরে বাড়িটা ছিল একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। উত্তম পুরুষের জবানিতে আত্মকথনের ভঙ্গিমায় এখানে ফুটে উঠেছে উদ্বাস্তুর স্মৃতি। উদ্বাস্তুর এই স্মৃতি কেন্দ্র করেই আখ্যানে ঘন হতে থাকবে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম। পিতা-মাতার মুখে শোনা তাদের বাংলাদেশকে কিছুতেই ভুলতে পারেনি ছেলেটি। অথচ দেশে ফেরার পথও বন্ধ। এই অবস্থায় এক বিকল্প বাস্তবতার গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে লেখক তাকে হঠাৎ হঠাৎ ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার নদী-নালা-খাল-বিলের দেশে :

> 'একদিন বাবার ঘরে পালঙ্কের উপর বসে হঠাৎ দেখলাম, আমার পায়ের নীচে একটা নদী বইছে, জলের শরীরে মিশে যাচ্ছে রক্তস্রোত। আমি চিৎকার করে ডেকেছিলাম, 'বিপিনবাবু---'
>
> ---কে ? কে কথা কয় ?
>
> ---আমি---
>
> ---ইন্দু কেমন আছে ?
>
> ---ইন্দু---
>
> ---আমার পোলা ইন্দু।
>
> ---ইন্দু নেই।

---ইন্দু নাই...ইন্দু নাই...। জলকল্লোল থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে আসে।'[৬৩]

নদীটি বাংলাদেশের কীর্তনখোলা নদী। পিতার কাছে সে শুনেছিল তার কথা। এখনে বাস্তব আর স্বপ্ন এলোমেলো হয়ে যায়। ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যাবার আরেকটি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করেছিলেন লেখক---এক বিরাট বড় পুরনো আয়না। আয়নাটি রাখা ছিল সেই পুরনো ঘরে। বেলজিয়ামের কাঁচের তৈরি। আয়নাটি আখ্যানে বহুবার আসবে এক জীবন্ত সত্তা নিয়ে। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই ছেলেটি না দেখা ঘটনাগুলো পরিষ্কার দেখতে থাকে :

'একদিন দেখেছিলাম, আয়নার ভেতরে অনেক পায়রা উড়ে যাচ্ছে। আরেক দিন ঘুড়ির কাটাকুটি খেলা। একদিন দূরের কোনো ছাদের আলসেয় হারমোনিয়াম দেখলাম। দরজার বাইরে এসে সেই ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখি, কই হারমোনিয়াম তো কোথাও নেই।'[৬৪]

উপন্যাসের তিন নম্বর অধ্যায়টি তো স্বপ্নের মতো। গল্প এখানে পরিচালনা করে স্মৃতি। পুরো অধ্যায়টিতে অতীত আর বর্তমান, স্বপ্ন আর বাস্তব সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। স্বশরীরে না গিয়েও স্মৃতির পথ ধরে সে স্পষ্ট দেখতে পায় তার প্রিয় শহর চন্দননগরকে বা লক্ষ্ণৌকে। স্মৃতির বাইরে বাস্তবে তার স্থাবর সম্পত্তি বলতে তার ঠাকুমার লেখা বাংলাদেশ থেকে পাওয়া গল্পের ডায়েরি। সেই ডায়েরির একটি অংশে ঠাকুমা বলেছিলেন : 'আমি সারাজীবন পুতুল হয়েই কাটিয়ে গেলাম। কারা যে আমাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেললো, বুঝতেই পারলাম না।'[৬৫]

বস্তুত যে ছায়াদের কারণে কথকের এই উদ্বাস্তু জীবন, নিজ বাসভূম থেকে নির্বাসন, আলোচ্য উপন্যাসে স্বপ্ন ও স্মৃতির পরম্পরা দিয়েই লেখক সেই ছায়াগুলোকে সনাক্ত করতে চেয়েছেন। তাদের অন্তরালে থেকে অত্যাচারের নির্লজ্জ নিদর্শনগুলো দেখিয়ে জানান দিলেন যে, এই আমাদের শ্রেণিশত্রু। সশস্ত্র সংগ্রাম নয়, এদের বিরুদ্ধে লড়বার মন্ত্র হল যূথবদ্ধ জীবন-যাপন আর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা। এই প্রসঙ্গেই গল্পের ভেতর কত যে গল্প, ফের তাঁর ভেতরে গল্প এসে যায় তাঁর ইয়ত্তা নেই।

এমনিভাবে আখ্যানের মধ্যে ঢুকে যায় কথকের ছোটবেলায় সাত বছর বয়সে হারিয়ে যাওয়া দাদার কথা। সেখানে চলতে থাকে মৃত মানুষের সাথে জীবন্ত মানুষের

কথোপকথন। মৃত্যুর পর কিভাবে তার দাদা তার বাবা-মা-দিদির সাথে ঘুরে বেড়াত অক্লান্ত ভাষায় সে ভাইকে বলে চলে :

'---তুমি তো কখনো বেড়াতে যাওনি।

---একবার গিয়েছিলাম।

---কবে ?

---আমি চলে যাওয়ার পর বাবা-মা যখন কুমায়ুনের পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াতে গেল। নৈনিতাল- রানিক্ষেত-আলমোড়া-কৌশানি-

---তুমি গিয়েছিলে ?

---মাটির ভেতরে গিয়ে শুলেই তো পিঠে দুটো ডানা গজিয়ে যায়। আমি উড়তে উড়তে মা-বাবার সঙ্গে গেলাম।

---তারপর ?

---যে হোটেলে মা-বাবা-দিদি উঠেছিল, সেখানে কেলো-কালী নামে একটা কুকুর ছিল। আমি তার ভিতরে ঢুকে গেলাম। কেলো-কালি হয়ে মা বাবার ঘরের সামনে সবসময় বসে থাকতাম। মা খুব আদর করত আমাকে, খেতে দিত। দিদি বারান্দায় এলেই, আমি ওর গা ঘেঁসে বসে থাকতাম। ওরা পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো, আমি ওদের পিছন পিছন হাঁটতাম।...

---তারপর ?

---তারপর একদিন রাতে কেলো-কালীর শরীর থেকে বেরিয়ে আমি ঘরের আয়নাটার ভেতর লুকিয়ে পড়লাম।... আর আয়না তখন আমাকে বলল---

---আমি অবাক---আইনাও কথা বলতে পারে ?

---কী বলল ?

---তুমি মাটির নিচে ফিরে যাও। তুমি আবার ফিরে আসবে।

---কবে ফিরে আসবে তুমি ?

---আমি তো এসেছি।

---কোথায় ?

---তুই নিজের গায়ের গন্ধ শুঁকেছিস ?

---না।

---অনেক পুরনো মাটির গন্ধ---একবার শুঁকে দেখ।'[৬৬]

বস্তুত ভালোবাসার টানে মৃত অতৃপ্ত আত্মার আবার এই পৃথিবীতে জীবন্ত হয়ে পৃথিবীর গন্ধ নিতে আসা, জীবিত-মৃতের সীমারেখাটিকে তালগোল পাকিয়ে দেয়। তারপর থেকে হারানো জীবনকে ফিরে পেতে স্মৃতির তরণী বেয়ে তার জীবনানুসন্ধানের উদগ্র নেশা চেপে বসল। রাতে ঘুমের মধ্যে হাত বিছিয়ে ডাকত মৃত মায়ার দেশের গন্ধ :

> 'গন্ধটার সঙ্গে পায়চারি করতে করতে, তার উৎস খুঁজতে খুঁজতে একসময় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেখলাম, হেমন্তের এক অরণ্য, যতদূর চোখ যায়, গভীর থেকে গভীরতরে হারিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় মনে হচ্ছিল, গোলাপি ও বেগুনি রঙের মিশেলে তৈরি কুয়াশার স্তরের পর স্তর পেরিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। বুঝতে পারছিলাম, অরণ্যের যত গভীরে আমি এগিয়ে চলেছি, ওই অচেনা গন্ধটা ধীরে ধীরে আরো গাঢ় হচ্ছে।...
>
> হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার চোখের উপর একটা অন্ধকার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি অনেকক্ষণ চোখ খুলতে পারিনি। ... চোখ সয়ে আসতে দেখলাম, দীর্ঘ দুটো গাছের কান্ড পড়ে আছে ... আমি একটা কান্ডের উপর গিয়ে বসলাম, তার গায়ে হাত রাখলাম, কিছুক্ষণ পর আমার হাতের পাতা ভিজে উঠলো। কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, অন্য কান্ডটার শরীরের এক জায়গায় কালো রঙের ছেঁড়াখোঁড়া দুটো হাতের ছাপ।
>
> হাতের ছাপ দুটোর দিকে আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। কার হাতের ছাপ ? অরণ্যের গভীরে এসে হলুদ এই কান্ডের উপর কে তার হাতের ছাপ রেখে গেছে ? এইসব প্রশ্নের ভেতরে লাট খেতে খেতে একসময় আমার চোখের সামনে একটা মুখ ভেসে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম অরণ্য পেরিয়ে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে ?'
>
> ---আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

---কেন ?

---একটা খুন---

---কোথায় ?

---কাছেই। ওই বাড়িটাতে। সে বাঁ হাত পেছন দিকে করে আঙুল দিয়ে দেখায়।

---কে খুন হয়েছে ?

---অনেকে। আমি তাদের নাম জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার পুরো শরীর কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিশে গেল, শুধু তার মুখ জেগে থাকলো আমার মুখোমুখি। আমি ভয় পেয়ে দৌড়াতে লাগলাম; কিছুদুর গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সেই জলকণার মুখ শূন্যে ভেসে আছে এবং আমারই দিকে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে। ... আমি নিশ্চিন্তে হাঁটতে লাগলাম। বাড়িটার দিকে যত এগোচ্ছি, অচেনা গন্ধটা থেকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। গন্ধটা কি তাহলে বাড়িটা থেকেই আসছিল ? ...

---বাড়ির মধ্যে কি আছে ?

---আগের পাহারাদার আমাকে বলে গিয়েছিল, এ-বাড়িতে নাকি অনেক মানুষ অনেকদিন ধরে ঘুমিয়ে আছে।

---তারা কখনো জেগে ওঠে না ?

---না। শুনেছি, ঘুমোতে ঘুমোতে তাদের শরীরের মাংস ক্ষয়ে গেছে, অনেকদিন ধরে শুধু কতগুলো হাড়গোড় ঘুমিয়ে আছে।

---এখানে কি অনেককে খুন করেছিল কেউ ?'[৬৭]

মার্কেসের 'One Hundred Years of Solitude'-এ আমরা দেখেছিলাম, একটি খুনের রক্তস্রোত কিভাবে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তার মায়ের রান্নাঘরে পৌঁছে গিয়ে জানান দিয়েছিল যে, সে মৃত আর এখানে স্বপ্নলব্ধ অজানা একটি গন্ধের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে নানা চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে জানান দিল উদ্বাস্তুর হাহাকার, মৃত শরীরের জীবনের কথা। আর একটু এগুলে অষ্টম অধ্যায়ে আমরা দেখব, সেই ঘরের প্রবেশ পথে একটা বিরাট ট্রেনের ছবি। সেই ট্রেনের উপরে শয়ে শয়ে মানুষ তাড়া খাওয়া জন্তুর মত সব পদ্মা নদীর ওপার থেকে আসছে। আরো একটু ভেতরে ঢুকলে

দেখতে পাবো কিছু মানুষের অদ্ভুত এলোমেলো পায়ের ছাপ। আরেকটু ভেতরে--- বুকটা হালকা হয়ে আসছে। দেখতে পাবো একটি ঘর নয়, থরে-বিথরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে শয়ে শয়ে বাড়ি, বুকে নিয়ে নানা বয়সী মানুষের সব হাড়গোড়। এমন সময় সে আবিষ্কার করে তার দাদু ঠাকুমার ঘরটিকে তাদের কঙ্কালের পাশেই রাখা ছিল তার ঠাকুমার আত্মজীবনীর খাতা। স্বপ্নে পাওয়া আত্মজীবনীর খাতাই হয়ে যায় তার জীবনের মহার্ঘ সম্পদ। এটি কী স্বপ্ন ! না কি বাস্তব ? যে জার্নিটা স্বপ্নে শুরু হয়েছিল, তার সমাপ্তি হল কিনা এমন একটি চরম বাস্তবতায় ! স্বপ্নের হাত ধরে এই যে সত্যে পৌঁছনো ; এটাকেই বলব আমরা বলব ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম।

বস্তুত ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত কিছু রাষ্ট্রনেতার জন্যই যে মানুষের এই নির্বাসিত জীবন, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। আমরা যেন সব পুতুলের মতো। রাষ্ট্রের ভয়ংকরতার কাছে, স্বার্থের কাছে ধর্মবাজিতে কাতারে কাতারে কত মানুষের জীবন যে ছারখার হয়ে গেছে, স্বপ্নের কঙ্কালের হাড় দিয়ে লেখক যেন তার হিসেব করতে বসেছেন। আমরাও সেই মৃতদের কাহিনী স্বপ্নের মধ্যে, স্মৃতির ভেতর দিয়ে শুনছি। আমরা কবে সেই 'Pedro Paramo'-এর মতো চেতনাহীন পুতুল হয়ে গিয়েছি, বুঝতেই পারিনি। পুতুল যদি বা নই, তাহলে প্রতিবাদ করছি না কেন ? এখনও পুরো অসার চেতনায় একটা তীব্র আঘাত দেবার জন্যই লেখক এই অদ্ভুত কৌশলে উদ্বাস্তুর আখ্যান রচনা করেছেন। পুতুলবৎ পাঠকের চেতনাকে আঘাত দেবার জন্যই লেখক বাস্তবতার মায়াজাল বিস্তার করেছেন।

এই আখ্যানের প্লট কোন একরৈখিক গতিতে চলেনি। অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট প্লটই হয়তো নেই ! স্মৃতিকথা আর স্বপ্নকথার স্রোত ধরে গল্পের প্রবেশ ঘটেছে এত গল্প; সেই গল্পের ভিতর আবার এত গল্প যে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। সব গল্পই আখ্যানে আসে ছেলেটির ঘুমের ঘোরের স্বপ্নের মধ্যে। তেমনি করে আসে তেমনি করে আখ্যানের মধ্যে আশ্রয় নেয় চিত্রশিল্পী তাব্রিজির গল্প (২য় অধ্যায়) অন্ধত্ব নিয়েও তার অমর সৃষ্টির কথা; ব্রিটিশের আক্রমণে কারবালা হয়ে যাওয়া জীবন নিয়েও মির্জা গালিবের গজল সৃষ্টির গল্প (৫ম. অধ্যায়), বেলজিয়াম কাচের আয়নাটার গল্প; মায়ের এমব্রয়ডারি করা ময়ূরের গল্প, একটি ভুতুড়ে বাড়িতে বাঘের সঙ্গে ছায়াপুতুলের নাটক দেখার গল্প; বৃষ্টির মধ্যে মাউথ-অর্গান বাজাতে থাকা জাদুকরের গল্প; সিপাই বিদ্রোহে

মৃত কালে খান আর ফলকআরার গল্প, যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্রোয়েশিয়ায় রিলেশনশিপ মিউজিয়ামের গল্প আর সর্বোপরি ভালোবাসার চিরন্তন প্রতীক ইউসুফ-জুলেখার গল্প।

স্মৃতির গভীরতায় ডুবতে ডুবতে যখন তার হৃদয় হয়ে যায় ক্ষতবিক্ষত, দগ্ধীভূত, না পাওয়ার বেদনায় যন্ত্রণাকাতর, তখন লেখক এক অদ্ভুত অলৌকিক বয়ান রচনা করবেন; একটি ভালোবাসার গল্প। মানব জাতির বাঁচবার শেষ ঠিকানা। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলে ছেলেটি অনুভব করে এক আশ্চর্য নারীর হাতছানি। জুলেখা। তার ডাকে সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। হাঁটতে... হাঁটতে... হাঁটতে... পৌঁছে যায় ক্রোয়েশিয়ায়। যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। গোলাগুলি বোমাবাজি। ধোয়ায় ধোয়ায় চতুর্দিক অন্ধকার। ভারী ভারী বুটের শব্দ। ছেলেটি জুলেখাকে প্রশ্ন করে, 'এখানে কারা যুদ্ধ করছে ? জুলেখা জানায়---'এটা যুদ্ধের দেশ, ভাঙতে ভাঙতে আরো কত ছোট হয়ে যাবে দেশটা কেউ জানে না'[৬৮] সেই স্বপ্নেই তারা হাজির হয় একটি মিউজিয়ামে। মিউজিয়াম অফ ব্রোকেন রিলেশনশিপ। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যখন দেশটা একদিন হারিয়ে যাবে, তখন এই সব স্মৃতির ভেতর বেঁচে থাকবে দেশটা। এই জন্যই সম্পর্কের স্মৃতিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

বস্তুত বাস্তবের গভীর সমস্যার কবলে পড়লেই ছেলেটির সঙ্গী হয় ঘুম। আর সে ঘুমের গভীর তলদেশ থেকে সংগ্রহ করতে থাকে নানা গল্পকথা। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের ভিতর পাওয়া জুলেখাই হয়ে যায় তার বাঁচবার শেষ ঠিকানা। সে ফিরে পায় তার মৃত ভালোবাসাকে। ভালবাসা কি কখনো মৃত হয় ! নাকি চেতনার গভীরে সদা জাগ্রত থাকে ? ভাবতে ভাবতেই সে আবার চলে যায় ঘুমের ঘোরে; সেই ছায়াপুতুলের গল্পের দেশে।

স্বপ্ন ও স্মৃতির জাদুকাঠি দিয়ে একটি আখ্যানকে জাদুবাস্তবতার কোন সীমানায় যে নিয়ে যেতে পারে, এই উপন্যাসটি তার নিদর্শন হয়ে থাকল।

তিন

বিশ্বভারতীতে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে (২০১৪) আলাপচারিতায় রবিশংকর বলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,- 'কেন লেখেন ?' মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিলেন 'লেজ থেকে একটি সাপ নিজেকেই খেয়ে চলেছে।' বুঝেছিলাম লক্ষ্য বেপরোয়া, অমিতাচারী মনুষ্যসমাজ। মনুষ্যসমাজে 'আত্মভক্ষণ' একুশ শতকে একটি ভয়ানক রোগ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। স্বার্থের নেশা আর অর্থনেশায় মশগুল হয়ে শুধু ধ্বংসের পর ধ্বংস-এ মানুষের রক্তদোষ। ১৭০৭-১৯৪৭ পর্যন্ত আড়াইশো বছরে ভারতবর্ষের উপর যে সুনামির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, তারই আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে 'দোজখ্‌নামা'য় (২০১০)। 'দোজখ্' অর্থ নরক। ভারতের দুই যুগান্তকারী প্রতিভা মির্জা গালিব ও সাদাত হাসান মান্টোর জীবন দিয়ে সেই নারকীয় সময়ের কথা তুলে ধরেছেন লেখক। আখ্যান চয়নের রীতিটিও বড় অদ্ভুত। মির্জাকে নিয়ে উর্দুতে লেখা মান্টোর একটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের অপ্রকাশিত ঘটনাক্রমকেই আলোচ্য আখ্যানে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই উপন্যাসটিতে মান্টো ভূমিকা অংশটি লিখছেন ১৮ জানুয়ারি ১৯৫৫-তে; যেদিন তিনি মারা যান। আর উপন্যাস লেখা হচ্ছে কবরে শুয়ে শুয়ে। মির্জার সাথে একান্ত গোপনীয় কথোপকথনে। তিনি চেয়েছেন এমন একটি গোপন নিশ্চিত আশ্রয়, যেখানে তৃতীয় কোন বাদীপক্ষ থাকবে না। অথচ থাকবে ভারতবর্ষের আড়াইশো বছরের ইতিহাসের কালো অন্ধকারময় চটুল ব্যর্থতার দিকগুলো। কবরে শুয়ে কথা বলাকেই তাঁদের নিশ্চিন্ত মনে হয়েছে। কারণ তাতে রাষ্ট্রের কর্কট দৃষ্টি, সমালোচকদের নিন্দা---কোন কিছুরই আক্রমণ তাদের সইতে হবে না। তাছাড়া দুই দেশে দু'জন। তাহলে আলাপন সম্ভব কিভাবে ? তাই কবরে শায়িত ! কেননা কবরে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই। মাটির গভীরে তো একটাই দেশ ! মান্টোর লেখা ভূমিকাটি একটু দেখে নেওয়া যাক :

> 'এই দস্তান কে লিখছে ? আমি, সাদাত হাসান মান্টো, না আমার ভূত ? মান্টো সারা জীবন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। মির্জা মহাম্মদ আসদুল্লা খান গালিব। ...
>
> আমি কতদিন মির্জার সঙ্গে একা একা কথা বলেছি। মির্জা চুপ করে থেকেছেন। কবরে শুয়ে থেকে কীভাবেই বা কথা বলবেন আমার সঙ্গে ? কিন্তু এখন, এত বছর অপেক্ষা করার পর আমি জানি, মির্জা এবার আমার সঙ্গে কথা বলবেন। আমিও আমার কবরে গিয়ে ঢুকেছি। ১৯৪৮ -এ পাকিস্তানে আসার পর থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, এবার আমার কবর আমাকে খুঁড়তে হবে, যাতে খুব তাড়াতাড়ি মাটির গভীর অন্ধকারে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারি।...

মির্জা এবার আমার সঙ্গে কথা বলবেন, আমরা কথা বলে যাব অনর্গল, মির্জা যা সারা জীবন কাউকে বলতে পারেননি, আমি যে কথা কাউকে বলতে পারিনি, সব---সব কথাই এবার আমরা বলব, কবরের ভিতরে শুয়ে শুয়ে। মির্জা শুয়ে আছেন, সেই দিল্লিতে, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার কাছে সুলতানজির কবরে, আর আমি লাহোরে মিঙা সাহেতার কবরে। একসময় তো একটাই দেশ ছিল, ওপরে যতই কাঁটাতারের বেড়া থাকুক, মাটির গভীরে তো একটাই দেশ, একটাই পৃথিবী। মৃতের সঙ্গে মৃতের কথাবার্তা কেউ আটকাতে পেরেছে ?...

মির্জা কখনও উড়তে পারেননি, আমিও পারিনি। কিন্তু এবার কবরের অন্ধকারে আমরা ডানা লাগিয়ে নেব; বন্ধুরা, আমরা সেইসব কিস্‌সা বলে যাব, যা আপনারা কখনও শোনেননি; সেইসব পর্দা সরিয়ে দেব, যার ওপারে কি আছে, আপনারা দেখেননি।

কবরের ভিতরে তাহলে কথাবার্তা শুরু হোক। আদাব।

সাদাত হাসান মান্টো

১৮ জানুয়ারি ১৯৫৫'[৬৯]

হাড় হিম করা মান্টোর এই আলাপন আমাদের নীরব, নিস্তব্ধ করে দেয়। আচ্ছন্ন হয়ে যাই একটা ঘোরে। সেই ঘোর কাটিয়ে উঠার আগেই যখন মূল উপন্যাস পাঠ শুরু করি এবার আমরাও যেন চলে যাই সেই কবরের ভেতর উঁকি মারতে। দেখি মান্টোসাব বলছেন :

'অনেক দূর থেকে আপনাকে দেখতে পাই মির্জাসাব, এই চিত হয়ে শুয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছেন, কখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে এমনভাবে শুয়ে থাকেন, মনে হয় যেন কবর আপনার মাতৃগর্ভ, হয়তো উঠে বসে দুলে দুলে নিজের মনে কি বলে যাচ্ছেন, কখনও মাথা নিচু করে আপনাকে পায়চারি করতে দেখতে পাই। তবে আমার এখন বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকতেই ভালো লাগে, এই অন্ধকারে। সেই ১৮৬৯ থেকে আপনি শুয়ে আছেন, কবরটা ঘরবাড়িই হয়ে গেছে, তাই না ? আমি তো সবেমাত্র এসেছি ওপরের

জগৎ থেকে, বড় ঝড়ঝাপটা গেছে সারা জীবন, তাই শুধু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।'[৭০]

উপন্যাসটিতে কবরে শুয়ে থেকেই দুটি মানুষের আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে উঠে আসবে পরাধীন ভারতবর্ষের কঙ্কাল। গালিব আর মান্টো কবরে শুয়ে শুয়ে এবার বলে যাবেন তাদের জীবনের একটার পর একটা অধ্যায়। যেখান থেকে আমরা জানব, এক বিখ্যাত গজলকারের জন্মকথা ও জীবনগাথা। জানবো এক বিখ্যাত কথাকারের ঝড়ঝাপটাময় বিবর্তন ও তার মধ্য দিয়েই পরাধীন ভারতবর্ষের ব্যর্থ লড়াই থেকে নতুন জারজ ভারতবর্ষের জন্মকথা। নিজের জীবনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কীভাবে শিল্পের অগ্নিশিখা জ্বেলেছিলেন মির্জা ও মান্টো---এটি কথাও বটে।

সাদাত হাসান মান্টো বলে যাবেন মির্জা গালিবের পূর্বপুরুষদের ভারতীয় সেনার পক্ষে লড়াই দেওয়ার কথা। বলে যাবেন ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের কথা ও সেই বিদ্রোহ কিভাবে মির্জার দিল্লির জীবনকে কারবালা করে দিয়েছিল তার কথা। ভারতীয় সিপাই আর বৃটিশ সেনার যৌথ আক্রমণে দিল্লি কিভাবে হয়ে গিয়েছিল একটি মৃত্যুপুরী তার কথা। কিন্তু ১৯৪৭ ! মান্টোর মতে তা ছিল আরও ভয়ংকর। 'আপনি ১৮৫৭ দেখেছেন কিন্তু ১৯৪৭ দেখলে আপনি আত্মহত্যা করতেন মির্জাসাব। এত হত্যা, ধর্ষণ, নেমকহারামি পৃথিবী আর কখনও দেখেনি।'[৭১]

মান্টোর এই অনর্গল বলে চলা কথার এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে কবরে শুনছিলেন মির্জা। এবার মির্জা কথা বলবেন। কিন্তু কাকে বলবেন ? 'এই মাটির পুতুলের রাজ্যে কার কাছে বিশ্বরহস্যের এর অর্থ শুধাব ? এখানে মানুষ নেই, মনুষ্যাকৃতি অবশ্য অনেকেই আছে !'[৭২] ১৮৫৭-র ক্ষত তাঁর জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল ! মির্জার মুখ থেকে আমরা জানব যে, তাঁর সর্বক্ষণের এক চাকর ছিল কাল্লু। ওমরাও বেগমের সঙ্গে তার পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবন হয়েছিল ব্যর্থ। এক সময় মনে হত শীত ছাড়া তার জীবনে যেন আর কোন ঋতু নেই। এখানে জানবো ঐ সময় গোরাদের আক্রমণে দিল্লি থেকে কিস্‌সা লেখকরা কীভাবে বিতাড়িত হয়েছিল। যে খোয়াব লায়লা-মজনুর জন্ম দিয়েছে, ইউসুফ-জুলেখার জন্ম দিয়েছে সেই খোয়াবকে নির্বাসন দিয়ে ব্রিটিশরা চায় শুধু ইতিহাস; রক্তে লেখা ইতিহাস, ক্ষমতার ইতিহাস। মানুষকে তারা মনে করতো রাস্তার কুকুর। কবরে শুয়ে শুয়েও এইসব কথা তাঁকে যেন

কিছুতেই পিছু ছাড়া করছে না। 'কবরে শুয়ে এইসব খোয়াব কতদিন দেখতে হবে, কে জানে !'[৭৩]

মির্জা সাহেব এবার যখন একটু রেস্ট নেবেন, তখন মান্টোর যেকথা শুরু হবে সেকথা শুনতে শুনতে আমাদের গায়ে আবার কাঁটা দেবে :

> 'মির্জাসাহেবকে একটু ঘুমোতে দেওয়া দরকার। আরও আরও মৃতরা, যাঁরা আমাদের আশেপাশে শুয়ে আছেন, আমাদের দুজনের কথা আপনারা শুনছেন, চলুন এবার আমরা উড়ে যাই, কাসিম জানের গলিতে মির্জাসাবের বাড়ির আশপাশে ছড়িয়ে পড়ব আমরা, চলুন, চলুন, উঠে পড়ুন, মির্জাসাব আর কাল্লুকে দস্তানগো যে কিস্‌সাটা বলছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে তা শুনে আসা যাক। সত্যি বলতে কী, লুকনোর তো প্রয়োজন নেই আমাদের, কেই বা আমাদের দেখতে পাবে ? তবে মির্জাসাব টের পেলেও পেতে পারেন, শুনেছি সারা রাত ঘুমের মধ্যে নাকি উনি মৃতদের সঙ্গে কথা বলতেন।'[৭৪]

এই হল আধুনিক বয়ান। সব মৃত মানুষেরা কথা বলে যাচ্ছে। ইতিহাসের সব সত্য কথা। একদম ঠোঁটকাটা সত্য। পাসপোর্ট-ভিসার কোন প্রশ্নই নেই। একদম উড়ে উড়ে চলছে। পাকিস্তানের কবর থেকে উড়ে উড়ে আসবে ভারত অভিযানে মির্জার দস্তানগো আবিদ মিঁঞার কাছে কিস্‌সা শুনতে। বাস্তবতাকে অলৌকিকতার মোড়কে পরিবেশন। একেই আমরা বলছি ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম।

অতঃপর পাশ ফিরে মির্জাসাব আবার চলে যাবেন তাঁর নিজের জীবনের কথায়।

তিন ভাই-বোনের একজন পাগল হয়ে গেল, আরেকজন বেশিদিন বাঁচেনি। মির্জা বেঁচেছিল যেন দোজখের আগুনে পুড়বে বলে। ন'বছর বয়সে গজল লিখে তিনি সৃজনের খেলায় জিতলেও, জীবনের খেলায় শুধু পরাজয়ের পর পরাজয় হয়েছিল। এভাবেই আসে কিস্‌সাকার শামসুদ্দিন তাবরিজির কথা, জালালউদ্দিন রুমির কথা, সপ্তদশ শতাব্দীর জাপানি হাইকু কবি মাৎসুয়ো বাশোর কথা। আগ্রার জীবনের কথা।

এই আগ্রা প্রসঙ্গেই মির্জাসাবকে প্রসন্ন লাগলো। আগ্রার জীবন ছিল তাঁর কাছে একটা নীল ঝকঝকে আকাশ। বেগম সাহেবার সাথে রোমান্টিকতা, ফলক আরা, আগ্রার জীবনটাই যেন ছিল 'খোয়াবের দস্তান'। ১৫৫৮ -র আকবরের এই রাজধানী

শহরটি ছিল যেন বাগানের শহর। রঙিন সুতোয় বাঁধা একটা তাসবির। সাজাহান ১৬৩৭ এ যখন রাজধানী নিয়ে গিয়েছিলেন শাহজাহানাবাদ-এ (এখন যা দিল্লি)। শুরু হয় নতুন দিল্লি গড়ার কাজ। হাজার হাজার মৃতের স্তুপের উপর গড়ে উঠেছিল নতুন রাজধানী শহর। সেই মৃত আত্মারা যেন সর্বক্ষণ ঘিরে থাকত মির্জাকে। আখ্যানে এবার আসবে অলৌকিকত্বের ভিতর আলৌকিকত্ব। জীবিত ও মৃত মানুষের কথোপকথন :

> 'দিল্লিতে এসে আমি সেদিন কিলা-ই-মুয়াল্লার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। আমি অনুভব করছিলুম কারা যেন আমার চারপাশে ঘিরে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাদের নিঃশ্বাসে পচা মাংসের গন্ধ।
>
> ---আসাদ। কে যেন আমাকে ডাকল।
>
> আমি চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। সবে তো দিল্লি এসেছি, কেই-বা আমাকে চিনবে ?
>
> ---কে আপনি ? আমি ভয়ে ভয়ে বললুম।
>
> ---কুতুব।
>
> ---আপনাকে তো আমি চিনি না। আপনি কোথায় ? আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?
>
> ---আমাদের দেখা যায় না আসাদ।
>
> ---কেন ?
>
> ---ওরা আমাদের মুছে ফেলেছে।
>
> ---কারা ?
>
> ---শাহজাহানাবাদ যারা তৈরি করেছে। ওরা বেছে বেছে আমাদের ধরে এনেছিল।
>
> ---তারপর ?
>
> ---সবাইকে মেরে কবর দিয়েছিল। সেই মাটির ওপরই তো শাহজাহানাবাদ দাঁড়িয়ে আছে।
>
> ---কেন তোমাকে মারা হয়েছিল ?
>
> ---আমি ওদের সামান্য জমিটুকু দিতে চাইনি। তাই আমাকে খাল্লাস করে দিল।...

---আসাদ ভাই---

---তুমি কে ?

---আমি ইউসুফ।

---তুমি কী করেছিলে ?

---তাকে শুধু দেখেছিলাম।

---কাকে ?

---তার নামও জানিনা। হাভেলির বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। শুধু বোরখার ভিতর দিয়ে তার চোখ দুটো দেখেছিলাম। ... ওরা আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ধরে নিয়ে গেল, একটা অন্ধকূপে ঢুকিয়ে দিল। তারপর একদিন---

---তুমিও কবরে চলে গেলে ইউসুফ ?

---জি।...

মান্টোভাই, সেদিন সারারাত আমি সেই আত্মাদের কথা শুনেছি, যাদের কোনও না কোনওভাবে অপরাধী বানানো হয়েছিল, তারপর হত্যা করে কবর দেওয়া হয়েছিল। আর সেই কবরের মাটির উপর গাঁথা হয়েছিল শাহজাহানাবাদের ভিত।'[৭৫]

বস্তুত ইতিহাসের এই কালো অধ্যায় আমরা কয়জন জানি ? যারা ইতিহাস লেখে তারা তো শাসকের চোখ দিয়ে কান দিয়ে লেখে। তাহলে সত্য ইতিহাস পাব কোথায় ? গভীর গোপন জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে এক অদ্ভুত আখ্যানের ভিতর দিয়ে লেখক ইতিহাসের সত্য উন্মোচন করেছেন। এখানে ঐতিহাসিক হতে গিয়েও আখ্যানটি হয়ে উঠল জাদুবাস্তবতাময় একটি আধুনিক উপন্যাস।

কেবল আগ্রা নয়; মির্জা সাহেবের মুখ থেকে আমরা শুনব কাশী, বারানসী প্রভৃতি তীর্থস্থানের অপূর্ব সৌন্দর্য্যের কথা। কলকাতা তথা বাংলার রূপ-মুগ্ধকর প্রকৃতির কথা, টপ্পাকার নিধুবাবুর কথা, সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন আর সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায়ের কথা। মির্জার জীবনের ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে দিল্লির ওঠাপড়াও যে গড়ে উঠেছিল এই উপন্যাসে, সেই ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জম্বু-কাশ্মীরের সৌন্দর্যময় প্রকৃতির কথাও উঠে আসবে মির্জার চিন্তার মধ্য দিয়ে। যে সত্য ঘটনাটি সব থেকে বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠবে সেটি হল, সিপাইদের আমলে দিল্লিতে আক্রমণ। মেরঠ থেকে

সিপাইরা এসে দিল্লির উপর চালানো হত্যার তান্ডবলীলা। রক্তে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল কত প্রাণ, লুঠপাট করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল কত বাড়িঘর, কত মানুষ যে হারিয়েছিল তাদের আশ্রয়---তাও এক অদ্ভুত ভাষ্যে উঠে এসেছে এখানে। সেই রক্তাক্ত অধ্যায় গৃহবন্দী হয়ে মির্জা সাহেব লিখতে লাগলেন এক **'দস্তম্ভু'** (ফুলের তোড়া)। কবরে শুয়ে শুয়ে সেই দুঃখের কথা মান্টোকে জানাচ্ছেন আজ মির্জা :

> 'ওই ছোটলোক সিপাহিদের রাজত্ব আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।...আমি নিজের চোখে দেখেছি, কেল্লার এক-একটি সৌন্দর্য সিপাইরা কীভাবে ধ্বংস করেছে। বিদ্রোহী জিইয়ে রাখার জন্য ওদের তখন শুধু দরকার রুটি আর পয়সা। ওরা কত অমূল্য সম্পদ বেচে দিয়েছিল। বিদ্রোহের নাম যদি এই বর্বরতা হয়, আমি তাকে সমর্থন করি না।...সিপাইরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে পারে---নগরের পর নগর ধ্বংস করতে পারে---স্বাধীনতা কখনও আনতে পারে না, মান্টোভাই। স্বাধীনতা আনতে পারে একমাত্র পথের মানুষ---তাদের হাতে অস্ত্র বলতে পাথর, গাছের ডাল, বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া দীর্ঘ দীর্ঘ শতাব্দীর লড়াইয়ের স্মৃতি---নিজের ঘর, নিজের নদী, নিজের জঙ্গল বাঁচানোর লড়াই---স্বাধীনতা তো শুধু মানুষের জন্য নয় মান্টোভাই---ঝর্ণার স্বাধীনতা, গাছের স্বাধীনতা, পাখির স্বাধীনতা, মাছের স্বাধীনতা---ব্যারাকের সৈনিক কি সেই স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারে ? ওদের তো শুধু যুদ্ধই শেখানো হয়েছে---স্বাধীনতার লড়াই তো বন্দুক-কামান নিয়ে যুদ্ধের চেয়ে বেশি কিছু।'[৭৬]

মৃত মির্জা সাহেব জানাচ্ছেন,- 'আমি আজ আপনাদের এত সব কথা বলতে পারছি, কিন্তু তখন মুখে কুলুপ এঁটে রাখার সময়।'[৭৭] সিপাইদের অত্যাচার এত চরমে উঠেছিল যে, তাঁর একসময় মনে হচ্ছিল, ইংরেজরা কবে দিল্লি দখল নেবে ! তাতে অন্তত শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু দিল্লির দখলের পর ব্রিটিশরা উপহার দিল একটি মৃত শহর। তখন সেখানে যেন একটাই কাল শীত। চতুর্দিকে কেবল ধ্বংসের চিত্র। কালো রক্তের দাগ। চতুর্দিক শ্মশান। শুনসান আর নীরবতায় ভরা। বস্তুত ইতিহাসের পাঠে আমরা শুধু সিপাহিদের সাফল্যের দিকগুলোই সবসময় লক্ষ্য করেছি কারণ

আমাদের সাফল্য দিকগুলোই ঐতিহাসিকরা দেখাতে শিখিয়েছেন। সিপাইরা কতখানি ধ্বংসের বিভীষিকা বয়ে এনেছিল সেই রূপটা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

এবার কবরের নিচে শুয়ে শুয়ে মান্টো বলে যাবেন তাঁর জীবনের লড়াই এর কথা। যেখান থেকে আমরা জানবো, ১৯১৮-তে তাঁর জন্মের পর থেকেই নিন্দুকদের নানা ঝড়খাপটা সামলে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। তাঁর জীবনের যে অধ্যায়টি সব থেকে জীবন্ত হয়ে আসবে সেটি ১৯৪৬-১৯৪৭-১৯৪৮-এর 'নো ম্যানস ল্যান্ড' ভারতবর্ষের কথা। সত্য কথা সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে সমালোচকরা যাঁকে পাগল, মানসিক রোগী বলে আখ্যা দেয়। আখ্যা দেয় পর্নোগ্রাফির লেখক বলে। তবুও মান্টোসাহেব এই ভদ্র সভ্য সমাজের মুখে লাথি মেরে, সব সময়ই তুলে ধরতেন উলঙ্গ সত্যকে। জান্নাত মান্টোও পাননি, জান্নাত মির্জাও পাননি। দুজনের জীবন যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। বাঁচার আশ্রয় স্বরূপ তাই দুজনেই সৃষ্টি করেছেন কিস্‌সা।

এই মান্টোর চোখ দিয়েই আমরা দেখতে পাব, দেশভাগের আগে প্রাচ্যের প্যারিস 'লাহোর'কে। দেখব লাহোরের হীরামান্ডী, ফরাজ রোড, জি বি রোডের রূপবতীদের কিস্‌সা। জানব দালাল চক্রের কাছে কতটা নতজানু হয়ে থাকতো এই এলাকার নারীরা তার চিত্র। জানব মুম্বাই, অমৃতসরের কথা। জাতপাত কেন্দ্রিক রাজনীতি ব্রিটিশরা কেমন করত এবং মুসলমানদের কতটা সন্দেহের চোখে দেখত সেই বর্বরতার কথা। পাব বোম্বে ফিল্মি দুনিয়ার কেচ্ছার কথা এবং শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য দেশটা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছিল ! নরক গুলজার -এর আরেকটি চোখের দেখা সত্য কাহিনি এবার বলে যাবেন মৃত মান্টোসাহেব, দেশভাগের বিষাক্ত বিষ কীভাবে পুরো দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছিল; চারিদিকে তাড়া করেছিল শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু তার ব্যাখ্যা করে চলতে থাকেন মান্টোসাহেব :

> 'একটা দেশ ভেঙে পরপর দু'দিনে দুটো দেশের জন্ম হল সারা হিন্দুস্তান জুড়ে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। কে ভুল, কে ঠিক, তা আমি আজ আর বিচার করতে চাই না---তার জন্য তো রাজনৈতিক নেতা, ঐতিহাসিকরাই আছেন---এই কবরের এই কবরেও দুঃস্বপ্নগুলো ফিরে ফিরে আসে।... কেউ বলেছে, এক লাখ হিন্দু মারা গেছে, কেউ বলেছে, এক লাখ মুসলমান মারা গেছে। আমি তাদের বলেছি, বল দু'লাখ মানুষ মারা গেছে।... মির্জাসাব, কাকে বোঝাবেন বলুন, ধর্ম

তো এভাবে মরে না, ধর্ম বেঁচে থাকে আমাদের হৃদয়ে, বিশ্বাসে। শুধু ধর্মের নামে ভাই ভাইকে হত্যা করেছে, ভাই বোনকে ধর্ষণ করেছে, আর এক দেশ থেকে অন্য দেশে উদ্বাস্তুর স্রোত বয়ে গেছে। ওই নেহেরু-জিন্না-পাটেরদের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কী ঘৃণা, কী অবিশ্বাস চারদিকে ! এই নেতারা সব ছারপোকা, ভাইজানেরা গরম জল ঢেলে তাদের নিকেশ করতে হয়। আমাদের মত মানুষের রক্ত খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। না, মির্জা এদের কথা বলতে ইচ্ছে করেনা।'[৭৮]

এই উলঙ্গ সত্য কথাটি জীবদ্দশাতেই কোন ভাবেই বলা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই মান্টো সাহেব বেছে নিলেন মৃত্যুর পরে কবরে শায়িত হয়ে এই সত্য কথাটি বলবে। উপস্থাপনার এই ভঙ্গিমাটি হল ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম। একমাত্র জাদুবাস্তবতার হাত ধরেই সম্ভব এই ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনেতাদের উলঙ্গ করে দেওয়া। এরাই দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষকে শুধু ধর্মের জিগির দিয়ে পাঠিয়েছিল মৃত্যুগুহায়। শ্যাম, ঈশ্বর সিং উদাহরণগুলো দেখতে দেখতে আমাদের হাড় হিম হয়ে যায়। অর্থাৎ দেশভাগ ছিল হত্যালীলার বীভৎস উৎসব। শুধু মানুষ হত্যা হয়েছিল তা তো নয়; হত্যা হয়েছিল পারস্পরিক বিশ্বাস, ভালোবাসা, নির্ভরতাও। চারিদিকে শুধু হাহাকার। মুসলমানরা যাচ্ছে পাকিস্তান, আর হিন্দুরা ভারত। উদ্বাস্তু শিবিরগুলি যেন সব গরু ছাগলের খোঁয়াড়। খাবার নেই, চিকিৎসা নেই। মানুষগুলোকে মানুষই ভাবেনি এরা।

বস্তুত সমকালীন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কিছু বললে প্রাণ সংশয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু চোখের সামনে দেখা একটি তান্ডব লীলা একজন সৃজনশীল মানুষ কতদিন বুকে করে বয়ে বেড়াবেন। মৃত্যুর পর কবরে শুয়ে শুয়ে তিনি মান্টোর কাছে বুক হালকা করবার পথটি বেছেছেন। আখ্যানের এই বিন্যাসটির অভিনবত্বকই টেক্সটটিকে জাদুবাস্তবতার ঘোরে নিয়ে যায়। শতাব্দী পেরিয়ে এই বাস্তবতাকে আজ শুধুই গল্প বলে মনে হয়।

ম্যাজিক রিয়ালিজমের আর একটি ভাষ্য নির্মিত হয়েছে মির্জাকে ঘিরে। ১৮৬৯-এ মৃত্যুর কয়েক বছর আগে। দিল্লির পুরো মহল্লা তখন শুনশান। জীবন্ত একটিও মানুষকে বিলক্ষণ লক্ষ্য করা যেত না। মির্জাও হয়ে গেলেন গৃহবন্দী। কিন্তু একজন সৃজনশীল মানুষ কি করে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকবেন ? বাইরে বেরিয়ে

এলেন। দেখলেন একটি কুকুর তাঁকে দেখে ঘেউ ঘেউ ডেকে উঠল। তারপর আখ্যানটি এক সম্মোহনীর জগৎ-এ প্রবেশ করবে । তখন মির্জা সাহেবের সঙ্গী হল একটি কুকুর তাকেই তিনি সম্বোধন করলেন 'মিয়া' বলে। দহনজ্বালা বাস্তবতা থেকে মুক্তির ঠিকানা স্বরূপ রচিত হল একটি মানুষ আরেকটি সাধকের কথোপকথন :

> 'আমিও মজা করে ডাকলুম, 'ঘেউ---ঘেউ---।'
>
> ---মির্জাসাব---
>
> আমি তো ভয়ে পিছিয়ে গেলুম। আরে, কুকুর আবার মানুষের মতো কথা বলে নাকি ?...
>
> সে আবার ডাকল 'মির্জা সাব---'।
>
> কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে বলে, 'চলুন না হয় রাস্তায় ঘুরে আসি। পথে ঠিক খাবার পাওয়া যাবে মির্জাসাব।'
>
> কাল্লুর পিঠে হাত রেখে বলি, 'দ্যাখ, আমার ধর্মরাজ কেমন বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। এবার মহাপ্রস্থানের পথে যাব। যা আমার লাঠিটা নিয়ে আয়।'
>
> সেই আমার মহাপ্রস্থানযাত্রা শুরু হল, মান্টোভাই।...হাঁটতে কষ্ট হয়, পা দিনে দিনে ফুলছে, চোখেও ঠিকঠাক দেখিনা; মিঞা আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখায়। গলির পর গলি, মহল্লার পর মহল্লা মুছে যেতে থাকে। ব্রিটিশ শহরকে ঢেলে সাজাচ্ছে।...
>
> ---ঘেউ---ঘেউ---মির্জাসাব---
>
> ---বলুন মিঞা।
>
> ---আমরা তাহলে কোথায় ?
>
> ---মাটির তলায়। শাহজাহানাবাদে যখন প্রথম এসেছিলুম, মাটির গভীর থেকে উঠে এসে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। কারা জানেন, মিঞা ? শাহজাহানাবাদ তৈরির সময় যাদের মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। ইংরেজরা এবার নতুন শহর তৈরি করেছে, আমাদের তো মাটির তলাতেই যেতে হবে। তা খারাপ হবে না, মিঞা, একে অপরকে জড়িয়ে শুয়ে থাকব।'[৭৯]

এই হল দহনলাগা বাস্তবতা থেকে মুক্তির ঠিকানা। সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য বিকল্প বস্তবতার বয়ান। এই নির্মাণকেই আমরা আখ্যায়িত করব ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম বলে।

উপন্যাসের শেষ অংশে এসে বর্তমান-অতীতের হিসেবটা একদম এলোমেলো হয়ে যাবে; যখন দেখব এত বড় একটি আখ্যান কবরের তলায় শুয়ে শুয়ে হতে হতে হঠাৎ পাকিস্তানের কবর থেকে উঠে মান্টো চলে এসেছেন সোজা ভারতের জামা মসজিদ চত্বরে, যেখানে মির্জাসাহেব কবরে শায়িত। কবর থেকে উঠে কাল্লু তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল ঐ চত্বরে। মির্জা তখনও কবরে ঘুমিয়ে। হঠাৎ কাল্লু প্রশ্ন করে :

'---এখানে কি করছেন, মান্টোভাই ?

---তুমি আমাকে চেনো ?

---চিনব না ? কাল্লু হাসে, 'কবরে শুয়ে শুয়ে এতদিন মির্জাসাব আর আপনার কত কিস্‌সা শুনলাম।'

---কবরে ?

---আপনিও তো কবরে ছিলেন, মনে নেই ?

---আমি তো এখনো মরিনি কাল্লু।

---তাই ? কাল্লু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'তাহলে হয়তো স্বপ্নে দেখেছি।'

---স্বপ্নে ! তুমি তো মরে গেছ কাল্লু---

---তাতে কি মান্টোভাই ?

---মরা মানুষ স্বপ্ন দেখে ?

---আলবত দেখে। দুনিয়াময় কত খোয়াব ঘুরে বেড়াচ্ছে জানেন ? যত মানুষ আছে দুনিয়ায় তার চেয়ে অনেক বেশি। আপনি কি কিস্‌সা শুনতে চান, মান্টোভাই ?

---কিস্‌সা ? কে শোনাবে ?

---ওই যে লোকটা, কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে।'[৮০]

এরপর লোকটি মান্টো আর কাল্লুকে বলে যাবে একের পর এক কিস্‌সা। বলে যাবে কিছু সন্তানহারা শোকগ্রস্ত মানুষের দিব্য দৃষ্টিতে সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকার কথা। বলে চলে এক দাকুকির কথা, যিনি মরুভূমির মাঝেও দিব্য দৃষ্টিতে সাতটি ফল যুক্ত গাছ এবং তাদের সাথে মানুষের মত কথা বলতে পেরেছিলেন। আর শেষে হাঁটতে

হাঁটতে এই দস্তানগোর ঝোলার পুতুল হয়ে গেলেন। দস্তানগো ঝোলায় হাত ঢুকায়। তারপর ঝোলা থেকে বের করে দাকুকিকে। মান্টো তো আবাক ! তারপর একের পর এক বাহাদুর সাহেব, মির্জা সাহেব, তারপর... ... ... মান্টো সাহেব। 'দস্তানগো তার ঝোলা থেকে একের পর এক কাঠের পুতুল বের করে মসজিদের চত্বরে সাজিয়ে দিতে থাকে। আমি অবাক হয়ে দেখি, এরা সবাই আমার 'দোজখ্‌নামা' উপন্যাসের চরিত্র। রঙিন পুতুলগুলো আলোয় ঝলমল করতে থাকে। ইতিহাসের ধুলোবালিতে ওরা মলিন হয়ে যায় নি।'[৮১]

এই হল বাংলা সাহিত্যের 'দস্তান'। এই হল একুশ শতকের উপন্যাস। এই হল ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে অনেক...অনেক...দূরের একটি আধুনিক উপন্যাসের আখ্যান। দুই মহাত্মা সৃজনশীল ব্যক্তির অন্তর দিয়ে ভারত দর্শন, দুই মৃত মানুষের কথোপকথন, তাদের স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের ভেতর স্বপ্ন, কিস্‌সা ভেতরে বপন করে আমাদের এই দোজখের মর্ত্য থেকে নিয়ে যায় এক সুস্থ-সুন্দর-স্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিকে।

একুশ শতকের এই ব্যাপ্ত পরিসরে দেখা গেল যে, ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌মের প্রয়োগে বাংলা উপন্যাসের আখ্যান সুবিস্তৃত মহীরুহে পরিণত হয়েছে। শাসকের চোখ রাঙানি আর সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে কথালিখিয়েদের কলম। কিছুটা দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিসর, কিছুটা অতীত ঐতিহ্যের পরম্পরা, কিছুটা স্বপ্ন ও স্মৃতির পরাভাষ্য, কিছুটা মিথোলজির প্রয়োগ, আর কিছুটা লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যের প্রভাবে নবীন লেখকরা সুস্থ বাস্তবতার নির্মাণের লক্ষ্যে আখ্যানের আধারে হঠাৎ হঠাৎ করে তুলে আনলেন অদ্ভুত প্রতিবাদী মন, হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার আলাপন, মৃত বিশ্বাসের পুনর্নির্মাণ। বাংলা উপন্যাসের স্বনির্ভরশীলতা জাদুবাস্তবতার কথকথায় যেন পূর্ণরূপে বিকশিত হল।

সূত্রনির্দেশ

১. নবারুণ ভট্টাচার্য, পাঠকের কাছে প্রশ্ন, *মুখে মেঘের রুমাল বাঁধা,* কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি : ২০০৬, পৃ. ৬৭

২. 'ব্যাস' পত্রিকা, জানুয়ারি : ২০০৭, পৃ. ৪২
৩. নবারুণ ভটাচার্য, *কাঙাল মালসাট,* অষ্টম সংস্করণ, কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি : ২০১৩, পৃ. ৬৭
৪. তদেব, পৃ. ৮৭-৮৮
৫. তদেব, পৃ. ৪৩-৪৫
৬. তদেব, পৃ. ৬২-৬৩
৭. তদেব, পৃ. ৬৫
৮. তদেব, পৃ. ১২৪
৯. কিন্নর রায়, *স্বপ্নপুরাণ,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট : ২০১২, পৃ. ২০-২৩
১০. তদেব, পৃ. ২৫-২৮
১১. তদেব, পৃ. ৩৩-৩৪
১২. তদেব, পৃ. ৩৭
১৩. তদেব, পৃ. ৫৮-৬০
১৪. কিন্নর রায়, *ধূলিচন্দন,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি : ২০০৫, পৃ. ১৮৬
১৫. তদেব, পৃ. ১৫
১৬. তদেব, পৃ. ১৯
১৭. তদেব, পৃ. ২৭
১৮. তদেব, পৃ. ৬১
১৯. তদেব, পৃ. ৬৮-৬৯
২০. তদেব, পৃ. ১৫০
২১. তদেব, পৃ. ১৬১-১৬৪
২২. তদেব, পৃ. ১৮৯-১৯০
২৩. উপন্যাসটির প্রথম খন্ড 'একটা রূপকথার বিবরণ অথবা কেয়ামতের দরবেশ হওয়ার কাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ -এ 'সংশিত' পত্রিকায়। দ্বিতীয় খণ্ড 'মার্কস ও মজনু শা'র অলৌকিক সাক্ষাৎকার' নামে ২০০১ সালে 'কথাকাব্য' পত্রিকায় এবং তৃতীয় খন্ড 'দ্রোহ' নামে ২০০২ সালে 'আরম্ভ' পত্রিকায় এবং শেষে

তিন খন্ড একত্রে বই আকারে 'মহরণ' নামে ২০০৩ সালে করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।

২৪. সোহরাব হোসেন, *মহারণ,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বৈশাখ : ১৪১৭, পৃ. ৬০

২৫. তদেব, পৃ. ৮৪

২৬. তদেব, পৃ. ৮৪-৮৫

২৭. তদেব, পৃ. ১৩৪-১৩৫

২৮. তদেব, পৃ. ২৪২

২৯. তদেব, পৃ. ২৭৬

৩০. তদেব, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

৩১. বইটি প্রথম খন্ড *ছায়ামানুষ* প্রকাশিত হয় ১৯৯৮-এ বইমেলায়। দ্বিতীয় খন্ড *'কায়ামানুষ'* বের হয় ১৯৯৯-এ এবং তৃতীয় খন্ড *অন্য সকাল* নামে কিছু অংশ বের হয় 'বিষরেখা' পত্রিকার ঈদ সংখ্যায়। তিনটি খন্ড একত্রিত হয়ে 'সরম আলির ভুবন' নামে বর্ধিত আকারে করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হয় বইমেলা ২০০৪ -এ।

৩২. সোহরাব হোসেন, *সরম আলির ভুবন,* কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা : ২০০৪ পৃ. ২৩-২৪

৩৩. তদেব, পৃ. ১৬৮

৩৪. তদেব, পৃ. ৩৪৮

৩৫. তদেব, পৃ. ৩৫০

৩৬. ২০০৮ এর এপ্রিল থেকে ২০১০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩৭. সোহরাব হোসেন, *মাঠ জাদু জানে,* প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা : ২০১১, 'না-কথা', পৃ. ৭

৩৮. তদেব, পৃ. ৫৫

৩৯. তদেব, পৃ. ৭২

৪০. তদেব, পৃ. ৭৯

৪১. তদেব, পৃ. ১৫৬-১৫৭

৪২. তদেব, পৃ. ১৯৪
৪৩. তদেব, পৃ. ২৯৩
৪৪. দেবর্ষি সারগী, *সওদাগর,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি : ২০১২, পৃ. ১৭-১৮
৪৫. তদেব, পৃ. ১৯
৪৬. তদেব, পৃ. ২১-২৩
৪৭. তদেব, পৃ. ৩২
৪৮. তদেব, পৃ. ৪১
৪৯. দেবর্ষি সারগী, *রূপান্তর,* কলকাতা, একুশ শতক, বৈশাখ : ১৪১৫, পৃ. ১০
৫০. তদেব, পৃ. ২১
৫১. তদেব, পৃ. ৬২
৫২. তদেব, পৃ. ৮৬, ৯৩
৫৩. তদেব, পৃ. ৯১
৫৪. দেবর্ষি সারগী, *রাম রায়,* কলকাতা, গাঙচিল, অক্টোবর : ২০০৯, পৃ. ৭
৫৫. তদেব, পৃ. ২৯-৩২
৫৬. তদেব, পৃ. ৩৮-৪২
৫৭. তদেব, পৃ. ৬৭
৫৮. তদেব, পৃ. ৬৭-৬৮
৫৯. তদেব, পৃ. ৮৩
৬০. তদেব, পৃ. ৯৪-৯৬
৬১. রবিশংকর বল, *স্মৃতি ও স্বপ্নের বন্দর,* কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, বইমেলা : ২০০৬, পৃ. ১৪
৬২. তদেব, পৃ. ১৭
৬৩. রবিশংকর বল, *ছায়াপুতুলের খেলা,* কলকাতা, গাঙচিল, জানুয়ারি : ২০০৮, পৃ. ১২-১৩
৬৪. তদেব, পৃ. ১৭
৬৫. তদেব, পৃ. ৩২
৬৬. তদেব, পৃ. ৪৮-৪৯

৬৭. তদেব, পৃ. ৫২-৫৭

৬৮. তদেব, পৃ. ৯২

৬৯. রবিশংকর বল, *দোজখ্‌নামা,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানিয়ারি : ২০১২, পৃ. ১৮-১৯

৭০. তদেব, পৃ. ২০-২১

৭১. তদেব, পৃ. ২৩

৭২. তদেব, পৃ :২৬

৭৩. তদেব, পৃ. ৩৩

৭৪. তদেব, পৃ. ৩৪

৭৫. তদেব, পৃ. ৭৫-৭৭

৭৬. তদেব, পৃ. ৩২৪-৩২৫

৭৭. তদেব, পৃ. ৩২৫

৭৮. তদেব, পৃ. ৩২৯-৩৩০

৭৯. তদেব, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮

৮০. তদেব, পৃ. ৩৭২-৩৭৩

৮১. তদেব, পৃ. ৩৭৯